বাংলা জাতীয় মাসিক

পরওয়ানা

www.parwana.net

অক্টোবর | ২০২৬



বাংলা জাতীয় মাসিক

পরওয়ানা

৩৩তম বর্ষ ■ ১০ম সংখ্যা

অক্টোবর ২০২৬♦ আশ্বিন-কার্তিক ১৪৩৩♦ রবি.সানী-জমা.আউ. ১৪৪৮

পৃষ্ঠপোষক
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
আহমদ হাসান চৌধুরী

সম্পাদক
রেদওয়ান আহমদ চৌধুরী

নিয়মিত লেখক
আবু নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান
রহমান মুখলেস
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান
মারজান আহমদ চৌধুরী

বিভাগীয় সম্পাদক
মুহাম্মাদ উসমান গণি

সহ-সম্পাদক
মনজুরুল করিম মহসিন
মো. মাহমুদুল হাসান
মুহাম্মদ জামান আহমদ

বিজ্ঞাপন ও বিপণন ব্যবস্থাপক
এস এম মনোয়ার হোসেন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
জাহিদ রাহি

যোগাযোগ
সম্পাদক, মাসিক পরওয়ানা
ফুলতলী কমপ্লেক্স ঢাকা
খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
মোবাইল: ০১৭৯৩ ৮৭৭৭৮৮

সিলেট অফিস
পরওয়ানা ভবন
৭৪ শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ
সোবহানীঘাট, সিলেট-৩১০০
মোবাইল: ০১৭৯৯ ৬২৯০৯০

parwanabd@gmail.com
www.parwana.net

মূল্য: ৩৫ টাকা

সূচিপত্র

তাফসীরুল কুরআন
আত-তানভীর/আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)
অনুবাদ: মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী ০৩

প্রবন্ধ
সালিহীনদের নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে বরকত লাভের বৈধতা/ড. ইবরাহীম শাবান আল মুরশিদী আল আযহারী ০৫
মক্কা চুক্তির ভূরাজনীতি : 'মুসলিম ন্যাটো' ও বাংলাদেশের সম্ভাবনা/মারজান আহমদ চৌধুরী ০৮
শাইখ আব্দুল কাদির জিলানী (র.) : জীবন, দর্শন ও উত্তরাধিকার/মুহাম্মাদ হুসাইন ১১
হেবা ও সম্পত্তি হস্তান্তর আইন সংশোধনী ২০২৬ : পর্যালোচনা এবং বিকল্প/ইমাদ উদ্দিন তালুকদার ১৫
আল কুদস পুনরুদ্ধার : একটি ঐতিহাসিক অভিযাত্রা/কাজী আবরার দস্তগীর ১৮

ফিকহ
বিবাহ সংক্রান্ত একটি সুক্ষ্ম মাসআলা ও পর্যালোচনা/ইব্রাহিম আরিফ ২১

সাক্ষাৎকার
কবি আবদুল মুকীত চৌধুরীর সাক্ষাৎকার ২২

আন্তর্জাতিক
হুথি-সৌদি সংঘাত : ইরান যুদ্ধের ধারাবাহিকতা নাকি ইয়ামান সংকটের নবপর্যায়?/মুহাম্মাদ বিন নূর ২৪

ধারাবাহিক
বিদআত : ধারণা ও বিশ্লেষণ/মো. জিয়াউর রহমান ৩০

নিয়মিত
এই মাসে এই চাঁদে ৩২
জীবন জিজ্ঞাসা ৩৩
বিজ্ঞান ৩৬
এক নজরে গতমাস ৩৭
আবাবীল ফৌজ ৩৯
সম্পাদকীয় ০২

সম্পাদক কর্তৃক বি.এন টাওয়ার (৯ম তলা), ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল ঢাকা-১০০০ হতে প্রকাশিত এবং সানজানা প্রিন্টার্স, ৮১/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।



সম্পাদকীয়

একটি দেশের নাগরিকদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার জন্য নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার, প্রয়োজনীয় জ্বালানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসব বিষয়ে যখন একসঙ্গে অস্বস্তি তৈরি হয়, তখন তার প্রভাব প্রত্যেক শ্রেণির জনগণের ওপর গিয়ে পড়ে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ নতুন করে সামনে এসেছে। রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে দিবালোকে হত্যা, ধর্ষণ, দখলদারি, চাঁদাবাজি, হামলা, নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতার খবর মানুষকে আতঙ্কের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এ অবস্থায় প্রশাসন শুধু অভিযান পরিচালনা কিংবা তদন্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। মানুষ যেন নিরাপত্তা পায়, অপরাধী যেন আইনের মুখোমুখি হয় এবং ভুক্তভোগী যেন ন্যায়বিচার পায় সে ব্যাপারটি শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে। রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে কেউ যেন যাচ্ছেতাই করতে না পারে, এ বিষয়ে সরকারকে আরও সচেতন ভূমিকা পালন করতে হবে।

দেশে নতুন করে দেখা দিয়েছে জ্বালানি সংকট। গ্যাস সরবরাহে বিঘ্ন, বিদ্যুৎ ঘাটতি এবং জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষ থেকে শিল্পকারখানা সবখানেই চাপ তৈরি করছে। সাম্প্রতিক সময়ে জ্বালানি তেলের দাম সর্বোচ্চ ১৭.৩৯ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। একই সময়ে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকটের কারণে শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, যা দেশের অর্থনীতির ওপর চাপ তৈরি করছে। বর্তমান বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট ও মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতা বাংলাদেশের পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করেছে। তাই সংকট মুকাবিলার দীর্ঘমেয়াদি পথ এখন থেকেই ভাবতে হবে। জ্বালানি আমদানিতে উৎসের বৈচিত্র্য, নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার, দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধান, প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থার যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া সময়ের দাবি।

.....

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা না পাওয়ায় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সরাসরি যোগ দিতে পারেননি ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস। যুক্তরাষ্ট্র টানা দ্বিতীয় বছরের মতো আব্বাস ও তার প্রতিনিধিদলকে ভিসা দেয়নি। অবশেষে ভিডিও বার্তার মাধ্যমে তিনি বক্তব্য দিয়েছেন। অন্যদিকে অগণিত মাযলুম মানুষ হত্যাকারী, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়া ব্যক্তি ইসরায়েলের সন্ত্রাসী প্রধানমন্ত্রী ঠিকই সশরীরে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থার কাছে আমাদের প্রশ্ন, ন্যায়বিচার কি তাহলে সবার জন্য সমান নয়? আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় এমন গুরুতর অভিযোগ থাকা একজন রাষ্ট্রপ্রধানের জাতিসংঘের মঞ্চে বক্তব্য দেওয়া এবং একই সময়ে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্টকে সরাসরি উপস্থিত হওয়ার সুযোগ না দেওয়ার ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই জনমনে প্রশ্ন তৈরি করে। সেই প্রশ্নের উত্তর আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকেই দিতে হবে।

আত্ তানভীর

আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী
ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)

অনুবাদ
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ–

অনুবাদ: বল, উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও; কিন্তু তাদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক। লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তারা কী ব্যয় করবে? বল, যা উদ্বৃত্ত। এইভাবে আল্লাহ তাঁর বিধান তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর। (সূরা বাকারা, আয়াত: ২১৯)

তাফসীর

(পূর্ব প্রকাশের পর)

হযরত সাঈদ বিন যুবাইর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়- তখন এক কওম মদ আর জুয়াকে ঘৃণা করতে লাগল যেহেতু এর মধ্যে গুনাহ রয়েছে। অপরদিকে অন্য এক কওম মদ পান করতে লাগল, যেহেতু এর মধ্যে উপকারও রয়েছে। শেষ অবধি আল্লাহ তাআলা يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ নাযিল করেন। তখন তারা নামাযের সময় মদ পান করা ছেড়ে দিল এবং নামায ছাড়া অন্য সময় মদ পান করতে লাগল। এজন্য আবার আল্লাহ তাআলা إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ আয়াত নাযিল করেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, জুয়ার কাছে গেলেও ধ্বংস হবে। হযরত আবূ তাওবা আল-মিশরী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি আবদুল্লাহ বিন উমরকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন- মদ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা তিনবার আয়াত নাযিল করেন। প্রথম আয়াত হলো- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ الآية এ আয়াত অবতীর্ণ হলে তারা সকলে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলেন- হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমরা তো মদ দ্বারা উপকৃত হই এবং তা পান করি, যেমন আল্লাহ তাআলা তাঁর বাণীতে উল্লেখ করেছেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! আমরা নামাযের সময় মদ পান করব না। এ কারণে আবার আল্লাহ তাআলা إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ আয়াত অবতীর্ণ করেন। তখন আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন- মদ হারাম হয়ে গেল।[১]

হযরত আবূ জাফর বলেন, আমাকে সুফইয়ান বিন ওকী বলেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে ইসহাক আল-আযরক বলেন, তিনি হযরত যাকারিয়া হতে রিওয়ায়াত করেন, তিনি হযরত সাম্মাক হতে রিওয়ায়াত করেন। তিনি হযরত শাবী হতে রিওয়ায়াত করেন। তিনি বলেন, মদ সম্পর্কে চারটি আয়াত নাযিল হয়। প্রথম আয়াত হলো- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ এ আয়াত নাযিলের পর তারা মদ ছেড়ে দিলেন। এরপর আয়াত নাযিল হলো- تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا -তা থেকে তোমরা মাদক ও উত্তম খাবার গ্রহণ করে থাক (সূরা নহল, আয়াত: ৬৭)। তখন আবার মদ পান শুরু করে দিলেন। সর্বশেষ সূরা মায়িদার দু'টি আয়াত নাযিল হয়-

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ –إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ[২]

হযরত ইবন বাশশার বলেন, আমাদেরকে আবদুল ওয়াহাব বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আউফ বলেন, তিনি আবূ কামুস যায়িদ বিন আলী হতে রিওয়ায়াত করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা মদ সম্পর্কে তিনবার আয়াত নাযিল করেন। প্রথমবার হচ্ছে يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ এ আয়াত নাযিলের পর মুসলমানরা মদ পান করতে লাগলেন। একদিন দু'জন লোক মদ পান করলেন, এরপর নামায পড়তে লাগলেন। দু'জনেই পরস্পর বকাবকি করতে লাগলেন এর কোনো মর্ম বুঝা যাচ্ছিল না! তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ الآية। তখন তারা নামায ছাড়া অন্য সময় মদ পান করতে লাগলেন। হযরত আবুল কামুস বলেন- একজন লোক মদ পান করে বদর যুদ্ধে নিহত লোকদের স্মরণে কান্না শুরু করে দিলেন। এ খবর রাসূল (সা.)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর চাদর মুবারক টানতে টানতে আসেন, এবং তাঁর হাতে কী একটা ছিল, তা নিয়ে তাকে মারতে উদ্যত হলেন। তখন লোকটি বলেন- আমি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের ক্রোধ হতে বাঁচতে চাই। আল্লাহর কসম আমি আর কখনো মদ পান করব না। তখনই আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করে মদ হারাম করেন।

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ الي قوله فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) এ আয়াত নাযিলের পর বলেন, আমরা তা থেকে বিরত থাকলাম, আমরা তা থেকে বিরত হলাম।[৩]

হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর লোকেরা মদ পান করতে থাকে। এমনকি একদা হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ কয়েকজন সাহাবীকে খাবারের দাওয়াত করেন। তাদের মধ্যে হযরত আলী বিন আবূ তালিব (রা.)ও ছিলেন। তিনি কুরআনের قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ আয়াত পাঠ করেন কিন্তু তা বুঝতে পারা যাচ্ছিল না। তখনই আল্লাহ

তাআলা কঠোরভাবে মদ সম্পর্কে বলেন-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা না বুঝো ততক্ষণ নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পরও মদপান হালাল ছিল। তারা ফজরের নামাযের পর মদপান করে যুহর পর্যন্ত থাকতেন। যুহরের নামায আদায় করার সময় তারা সুস্থ থাকতেন। এরপর ইশার নামায পর্যন্ত আর পান করতেন না। ইশার নামাযের পর আবার পান করতেন, এমনকি অর্ধরাত পর্যন্ত, তারপর ঘুমিয়ে পড়তেন অতঃপর তারা সুস্থ অবস্থায় ফজরের নামাযে উঠতেন। এ নিয়ম তাদের মধ্যে চলতে থাকে। এমন এক মুহূর্তে হযরত সাদ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস একটা ভোজের ব্যবস্থা করলেন। এতে মহানবী (সা.)-এর কিছু সাহাবীকে দাওয়াত করলেন। তাদের জন্য উটের মাথা ভূনা করেছিলেন। খাবার শেষে তাদেরকে মদ পরিবেশন করা হল এবং তারা নেশাগ্রস্ত হয়ে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলতে লাগলেন। এক পর্যায়ে সাদ (রা.) এক আনসারী সাহাবীকে কিছু বলে ফেললেন, এতে আনসারী সাহাবী রাগান্বিত হন। তিনি রাগের চটে উটের চিবুকের হাড় নিয়ে উঠেন এবং হযতর সাদ (রা.)-এর নাকে আঘাত করে তা ভেঙে ফেলেন। তখনই আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন-

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ –إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ[৪]

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

তারা আপনাকে প্রশ্ন করে তাদের সম্পদ হতে কোন সম্পদ সদকা হিসেবে খরচ করবে? হে মুহাম্মদ (সা.) আপনি তাদেরকে বলে দিন, যা তাদের জন্য অতিরিক্ত তা খরচ করার জন্য। এখানে **العفو** শব্দের অর্থ অতিরিক্ত। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- **العفو** শব্দের দ্বারা বুঝানো হয়েছে পরিবারের জন্যে যতটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত জিনিস। হযরত আতা ও হযরত সুদ্দী (র.) বলেন- **العفو** বলে অতিরিক্ত বুঝানো হয়েছে।

হযরত ইবন যায়িদ (রা.) বলেন, প্রত্যেক মানুষই জানে একদিনে তার কতটুকু প্রয়োজন। তা বাদ দিয়ে যা থাকে, তাই **عفو** বলে গণ্য করা হয়।[৫] হযরত হাসান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, **عفو** অর্থ **فضل**। আর **فضل** হচ্ছে অতিরিক্ত মাল। কেউ কেউ বলেন- **عفو** বলতে মধ্যম ধরনের সদকাকে বুঝানো হয়েছে যা অপব্যয়ও হবে না আবার কৃপণতা হতেও মুক্ত। অন্য তাবীলকারীরা বলেন **عفو** শব্দের অর্থ মধ্যপন্থায় এমন খরচ যাকে অপব্যয় এবং কার্পন্য বলে গণ্য করা হয় না। কেউ বলেন, **عفو** এর অর্থ হলো- ফরয সদকা অর্থাৎ যাকাত।[৬]

অতঃপর আহলে ইলম এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। এ আয়াত কি মানসূখ হয়ে গেছে, না বান্দাদের উপর ইহার হুকুম এখনও বাকি আছে? তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোকেরা বলেন, যাকাত ফরয হওয়ার আয়াত দ্বারা তা মানসূখ হয়ে গেছে।

হযরত ইবন আব্বাস হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ তাআলার পবিত্র বাণী- وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ সম্পর্কে বলেন, এ বিধান যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বে ছিল। হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যাকাতের আয়াত উক্ত আয়াতকে মানসূখ করেছে।

কেউ কেউ বলেন- এ আয়াতের হুকুম এখনো বাকি আছে, তা মানসূখ হয়নি। হযরত মুজাহিদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, **العفو** শব্দ দিয়ে ফরয সদকাকে বুঝানো হয়েছে। এসব উক্তির মধ্যে সঠিক মত হলো- হযরত ইবন আব্বাস (রা.)-এর মত, যা হযরত আতিয়া (রা.) রিওয়ায়াত করেন।

অর্থাৎ, আল্লাহর বাণী– قُلِ الْعَفْوَ -বলুন, অতিরিক্ত অংশ ব্যয় করো" দ্বারা এমন কোনো নির্দিষ্ট ফরয ব্যয়ের বিধান দেওয়া হয়নি, যা আল্লাহ মানুষের সম্পদের ওপর বাধ্যতামূলক করেছেন। এর দলীল হচ্ছে কোন ব্যক্তি যখন নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিল কোন ধরনের ব্যয় আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উপায়? তখন তার প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে ব্যয় করা তাঁর কাছে পছন্দনীয়।

সুতরাং এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের জন্য একটি শিক্ষা ও আদব বিশেষ করে ফরয যাকাতের অতিরিক্ত নফল সদকা ও দানের ক্ষেত্রে কীভাবে ব্যয় করতে হবে, সে বিষয়ে। এই বিধান বহাল রয়েছে; এটি এমন কোনো পূর্ববর্তী বিধানকে রহিত করেনি, যার বিপরীত কোনো বিধান আগে ছিল; আবার পরবর্তী কোনো বিধানও এটিকে রহিত করেনি। অতএব, কোনো পরহেজগার ও দ্বীনদার ব্যক্তির জন্য নফল সদকা, উপহার ও দান করার ক্ষেত্রে নিজের সামর্থ্যের সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়। বরং নবী (সা.) যে নীতিমালা শিক্ষা দিয়েছেন, তার অনুসরণ করা উচিত।

নবী কারীম (সা.) বলেছেন, তোমাদের কারও কাছে যদি অতিরিক্ত কিছু থাকে, তাহলে সে প্রথমে তা নিজের জন্য ব্যয় করবে; এরপর তার পরিবারের জন্য; এরপর তার সন্তানদের জন্য। তারপর অতিরিক্ত যা থাকে, তা সে এমন কাজে ব্যয় করবে যা আল্লাহ পছন্দ করেন ও যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন।

এটাই হলো উদারতা ও কৃপণতার মধ্যবর্তী ভারসাম্যপূর্ণ পথ।[৭]

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

অর্থাৎ- যেভাবে আমি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি আমার ঘোষণা এবং আমার দলীলাদি আর তা হচ্ছে এ সূরার মধ্যে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহ, অতঃপর তোমাদেরকে স্পষ্ট হিদায়াতের পথ দেখিয়ে দিয়েছি, এভাবে আমি তোমাদের জন্যে আমার সকল বিধান কিতাবসমূহে বর্ণনা করেছি, যে কিতাব নাযিল করেছি নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর। আমি আমার নিদর্শনসমূহ এবং দলীলসমূহ তোমাদের জন্যে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি, যেন তোমরা আমার প্রতিজ্ঞা ও শাস্তি সম্পর্কে, আমার সাওয়াব এবং আযাব সম্পর্কে গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা করতে পার। যেন তোমরা আমার আনুগত্যের রাস্তা দ্রুতগতিতে অতিক্রম কর, যার মাধ্যমে তোমরা পরকালে আমার সাওয়াবের অধিকারী হবে, আর তোমরা যেন চিরন্তন নিআমতের অধিকারী হতে পার অতি সামান্য পার্থিব জগতের নিআমতের মুকাবিলায়, যা অতিক্রম করে সকলকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। সেদিন আমার শাস্তির এবং আযাবের মুকাবিলায় কারো কাছ থেকে কিছুই গ্রহণ করা হবে না।

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ এ আয়াতের অর্থ সম্পর্কে বলেন- এ আয়াতের মূল কথা হচ্ছে দুনিয়ার স্থিরতা নেই এবং তা অস্থায়ী, পক্ষান্তরে আখিরাত হচ্ছে আসন্ন এবং স্থায়ী। হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ তাআলার বাণী- لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ সম্পর্কে বলেন, তোমরা জানতে পারবে দুনিয়ার বিনিময়ে আখিরাতের ফদীলত কত যে বেশি।[৮]

১. তাবারী, ৪/৩৩০-৩৩১; ২. তাবারী, ৪/৩৩৩-৩৩৪; ৩. তাবারী, ৪/৩৩২-৩৩৪; ৪. তাবারী, ৪/৩৩৪-৩৩৫; ৫. তাবারী, ৪/৩৩৭-৩৩৮; ৬. তাবারী, ৪/৩৩৮-৩৪০; ৭. তাবারী, ৩৪৪/৩৪৫; ৮. তাবারী, ৩৪৭/৩৪৮;

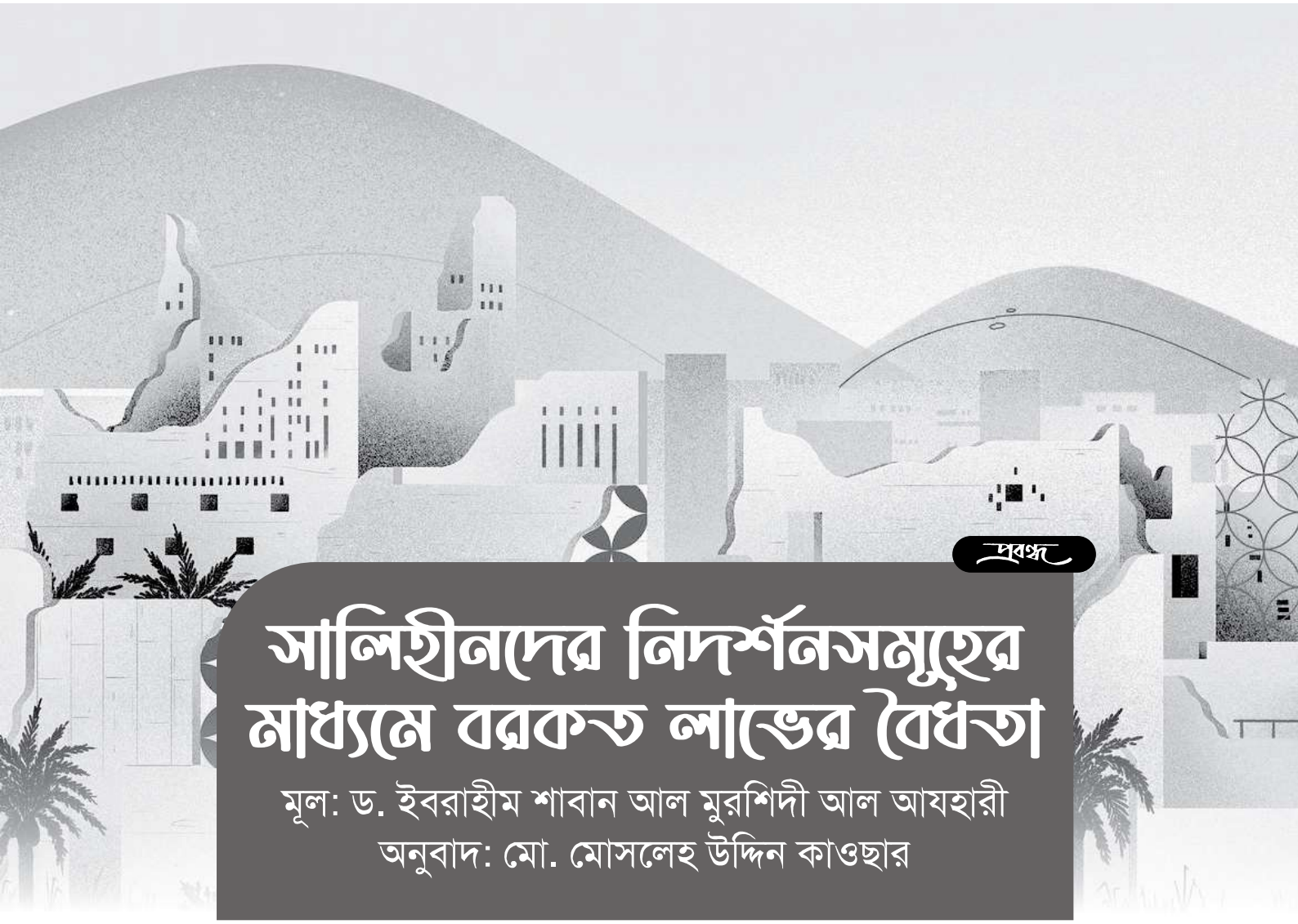

প্রবন্ধ

সালিহীনদের নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে বরকত লাভের বৈধতা

মূল: ড. ইবরাহীম শাবান আল মুরশিদী আল আযহারী
অনুবাদ: মো. মোসলেহ উদ্দিন কাওছার

(পূর্ব প্রকাশের পর)

ইমাম শামস উদ্দীন আল বিরমাভী (র.) (ইন্তিকাল: ৮৩১হি:) এর বক্তব্য:

সাহাবায়ে কিরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযূর অবশিষ্ট পানির মাধ্যমে বরকত লাভের হাদীসের[1] ব্যাখ্যায় ইমাম শামস উদ্দীন আল বিরমাভী (র.) বলেন,

ففيه جَوازُ ضَرْب الخِيَام والقِبَاب، والتَّبرُّكُ بآثار الصَّالحين، وطَهارةُ المُستعمَل، ونَصْبُ علامة بين يَدَي المُصلّي، وخدمةُ السَّادات.

-এই হাদীস তাঁবু স্থাপনের বৈধতা, সালিহীনদের নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে বরকত লাভ করা, মুস্তা'মাল পানি পবিত্র হওয়া, মুসল্লীর সামনে চিহ্ন স্বরূপ কিছু খাড়া করে রাখা এবং নেতৃত্বস্থানীয়দের খিদমত করার প্রমাণ।[2]

ইমাম শামস উদ্দিন ইবন আল জাযারী (র.) (ইন্তিকাল: ৮৩৩ হি:) এর বক্তব্য

কিরাতের ইমাম ও সুদক্ষ মুহাদ্দিস ইমাম শামস উদ্দিন ইবন আল জাযারী (র.) কিরাত শাস্ত্রের ইমাম আল্লামা শাতবী (র.) এর কবর যিয়ারত প্রসঙ্গে বলেন,

وَقَبْرُهُ مَشْهُورٌ مَعْرُوفٌ، يُقْصَدُ لِلزِّيَارَةِ، وَقَدْ زُرْتُهُ مَرَّاتٍ، وَعَرَضَ عَلَيَّ بَعْضُ أَصْحَابِي الشَّاطِبِيَّةَ عِنْدَ قَبْرِهِ، وَرَأَيْتُ بَرَكَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ قَبْرِهِ بِالْإِجَابَةِ، رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ.

-ইমাম শাতবী (র.) এর কবর প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত। যিয়ারাতের জন্য সেখানে বহু মানুষ গমন করেন। আমি সেখানে কয়েকবার যিয়ারাত করতে গিয়েছি। আমার কয়েকজন সাথি তাঁর কবরের পাশে আমার নিকট তাঁর লিখিত 'আশ শাতিবিয়্যাহ' পড়ে শুনিয়েছেন। আমি তাঁর কবরের পাশে দুআ করলে তা কবুল হওয়ার বরকত প্রত্যক্ষ করেছি। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন এবং সন্তুষ্ট হোন।[3]

ইমাম শিহাব উদ্দিন ইবন রাসলান আশ শাফিঈ (র.) (ইন্তিকাল:৮৪৪হি:) এর বক্তব্য:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ ব্যক্তির উপর উযূর অবশিষ্ট পানি ছিটিয়ে দেওয়ার হাদীসের[4] ব্যাখ্যায় ইমাম ইবন রাসলান (র.) বলেন,

وَفِيهِ التَّبَرُّكُ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ مِنْ فَضْلِ طَهُورٍ وَأَكْلٍ وَلُبْسٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تُرْتَجَى بِهِ الْبَرَكَةُ؛ وَلِأَنَّهُ مِمَّا يُتَدَاوَى بِهِ

-এতে নেককার ব্যক্তিদের নিদর্শনসমূহ (ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসের) মাধ্যমে বরকত লাভের প্রমাণ রয়েছে। যেমন; তাঁদের অবশিষ্ট পানি, খাদ্য, পোশাক এবং এমন অন্যান্য জিনিস; যেগুলোর মাধ্যমে বরকত লাভের আশা করা হয়। কেননা এগুলো এমন বিষয়, যেগুলোর মাধ্যমে আরোগ্য লাভ হয়।[5]

শাইখুল ইসলাম হাফিয ইবন হাজার আল আসকালানী (র.) (ইন্তিকাল: ৮৫২হি:) এর বক্তব্য

হযরত ইতবান ইবন মালিক (রা.) এর হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফিয ইবন হাজার আল আসকালানী (র.) বলেন,

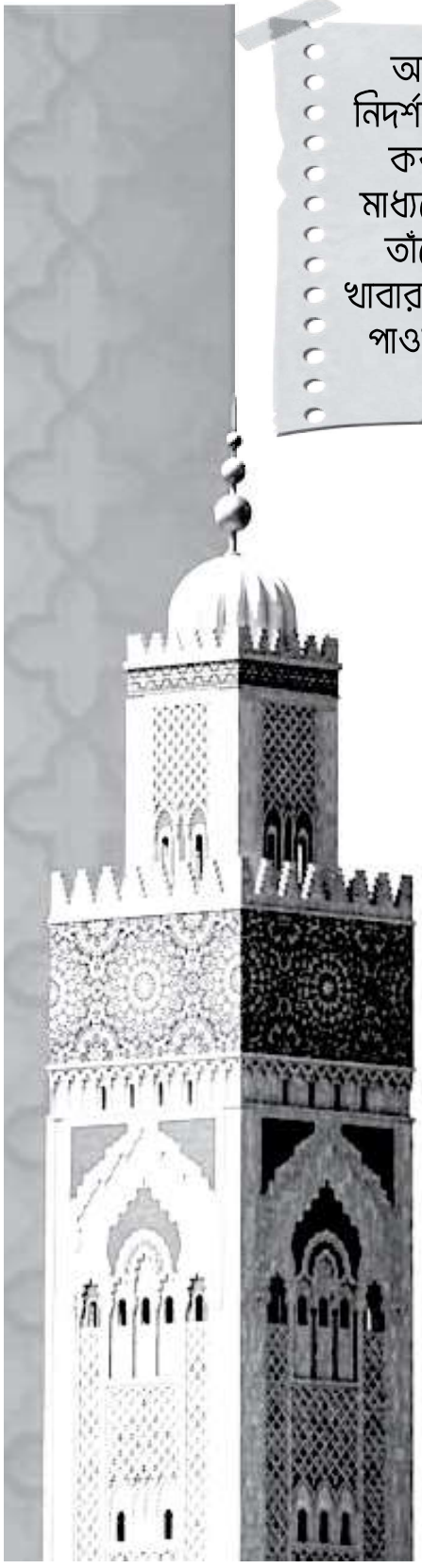

অনুরূপভাবে, সালিহীনদের নিদর্শনসমুহের দ্বারা বরকত লাভ করা এবং তাঁদের নিদর্শনের মাধ্যমে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে তাঁদের নিকট হতে পোশাক, খাবার, দিরহাম অথবা অন্যান্য বস্তু পাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া উচিত।

وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عِتْبَانَ وَسُؤَالُهُ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ لِيَتَّخِذَهُ مُصَلًّى وَإِجَابَةُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى ذَلِكَ، فَهُوَ حُجَّةٌ فِي التَّبَرُّكِ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ

-পূর্বে হযরত ইতবান (রা.) এর হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। যে হাদীসে রয়েছে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ঘরের একটি স্থানে নামায পড়ার অনুরোধ করেন যাতে তিনি সেই জায়গাকে তাঁর নামাযের স্থান হিসেবে গ্রহণ করবেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সে অনুরোধ রাখেন। সুতরাং এটি সালিহীনদের নিদর্শনসমূহের দ্বারা বরকত লাভের একটি দলীল।[6]

এছাড়াও ইমাম ইবন হাজার আসকালানী (র.) তাঁর 'আল মাত্বালিবুল আলিয়া বিযাওয়াইদিল মাসানীদ আস সামানিয়াহ' গ্রন্থে 'সালিহীনদের নিদর্শনসমূহের বরকত লাভের অধ্যায়' শিরোনামে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় নির্ধারণ করেছেন।

ইমাম বদর উদ্দিন আইনী (র.) (ইন্তিকাল: ৮৫৫হি:) এর বক্তব্য

যে হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যা হযরত সায়্যিদা যাইনাব (রা.) এর ইন্তিকালের পর তাঁর গোসল দেওয়ার সময় উম্মে আতিয়্যাহ (রা.) কে বলেছিলেন,

فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ.

তোমরা গোসল শেষ করে আমাকে জানিও। উম্মে আতিয়্যাহ (রা.) বলেন, আমরা শেষ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জানালাম। তিনি তাঁর চাদর আমাদেরকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটিকে তাঁর ভিতরের কাপড় হিসেবে পড়াও।[7]

সেই হাদীসের এই অংশের তা'লীকে ইমাম বদর উদ্দিন আইনী (র.) বলেন,

اِجْعَلْنَ هَذَا الْإِزَارَ شِعَارَهَا، وَسُمِّيَ شِعَارًا لِأَنَّهُ يَلِي شَعْرَ الْجَسَدِ، وَالدِّثَارُ مَا فَوْقَ الْجَسَدِ، وَالْحِكْمَةُ فِيهِ التَّبَرُّكُ بِآثَارِهِ الشَّرِيفَةِ، وَإِنَّمَا أَخَّرَهُ إِلَى فَرَاغِهِنَّ مِنَ الْغُسْلِ وَلَمْ يُنَاوِلْهُنَّ إِيَّاهُ أَوَّلًا لِيَكُونَ قَرِيبَ الْعَهْدِ مِنْ جَسَدِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الشَّرِيفِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَ انْتِقَالِهِ مِنْ جَسَدِهِ إِلَى جَسَدِهَا فَاصِلٌ، وَهُوَ أَصْلٌ فِي التَّبَرُّكِ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ.

-তোমরা এই ইযারটিকে তাঁর শি'আর (ভেতরের কাপড়) হিসেবে পরিধান করাও। এটিকে শি'আর বলা হয় কেননা এর নিচে শরীরের শা'আর (পশম) থাকে। আর দিসার হলো এমন পোশাক যা শরীরের (সব থেকে) উপরে থাকে। এর মধ্যে হিকমাত হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নিদর্শনের মাধ্যমে বরকত লাভ করা। মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল দেওয়া শেষ করা পর্যন্ত বিলম্ব করেছেন এবং এটি প্রথমেই তাঁদের হাতে দেননি যাতে চাদরটি তাঁর শরীর মুবারক হতে সদ্য বিচ্ছিন্ন হওয়া অবস্থায় থাকে এবং কোন ব্যবধান ব্যতীত তাঁর শরীর মুবারক হতে তাঁর কন্যার শরীরে সরাসরি স্থানান্তরিত হয়। এটি নেককারদের নিদর্শনসমূহ হতে বরকত লাভের একটি আছল (মূলভিত্তি)।[8]

ইমাম শামসুদ্দীন আস সাখাভী (র.) (ইন্তিকাল: ৯০২ হি:) এর বক্তব্য

তিনি ইমাম আহমদ ইবন ইসমাইল ইবন আবী বকর আল আযহারী আশ শাফিঈ (র.) এর জীবনীতে লেখেন,

ثُمَّ دُفِنَ بِالْبَقِيعِ، بِالْقُرْبِ مِنْ قَبْرِ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ، وَكَانَ لَهُ مَشْهَدٌ حَافِلٌ جِدًّا، وَتَأَسَّفَ النَّاسُ خُصُوصًا أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَلَى فَقْدِهِ، وَقَبْرُهُ ظَاهِرٌ يُزَارُ، رَحِمَهُ اللهُ وَإِيَّانَا، وَنَفَعَنَا بِبَرَكَاتِهِ

-অতঃপর তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে ইমাম মালিক (র.) এর কবরের নিকটে দাফন করা হয়। তাঁর জানাযায় বিপুলসংখ্যক মানুষ উপস্থিত হয়েছিল। তাঁর ইন্তিকালে মানুষ বিশেষত মদীনাবাসীরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিল। তাঁর কবরটি সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত রয়েছে এবং সেখানে যিয়ারত করা হয়। আল্লাহ তাঁর এবং আমাদের প্রতি রহম করুন এবং তাঁর বরকতের মাধ্যমে আমাদের উপকৃত করুন।[9]

আল্লামা আবুল আব্বাস শিহাব উদ্দিন আল কাসতাল্লানী (র.) (ইন্তিকাল: ৯২৩হি:) এর বক্তব্য

যে হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন সাহাবী তাঁর চাদর মুবারক চেয়েছিলেন। এবং এর উদ্দেশ্য হিসেবে তিনি বলেছিলেন,

إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي

-আমি এটি এজন্যই চেয়েছি যাতে তা আমার মৃত্যুর পর আমার কাফন হয়।[10]

সে হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম কাসতাল্লানী (র.) বলেন,

وَفِيهِ التَّبَرُّكُ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ، وَجَوَازُ إِعْدَادِ الشَّيْءِ قَبْلَ وَقْتِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ.

-এতে সালিহীনদের নিদর্শনের মাধ্যমে বরকত লাভের দলীল রয়েছে এবং প্রয়োজনের সময় আসার পূর্বেই কোনো জিনিস প্রস্তুত করে রাখার বৈধতারও দলীল রয়েছে।[11]

শাইখুল ইসলায যাকারিয়া আল আনসারী (র.) (ইন্তিকাল: ৯২৬হি:) এর বক্তব্য

সাহাবায়ে কিরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্পর্শ করে এবং তাঁর উযূর অবশিষ্ট পানির দ্বারা বরকত লাভের হাদীসের ব্যাখ্যায় শাইখুল ইসলাম যাকারিয়া আল আনসারী (র.) বলেন,

وَفِي الْحَدِيثِ: جَوَازُ ضَرْبِ الْخِيَامِ وَالْقِبَابِ، وَالتَّبَرُّكُ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ.

-এই হাদীসে তাঁবু স্থাপন করার বৈধতা এবং নেককার ব্যক্তিদের নিদর্শনের দ্বারা বরকত লাভ করার দলীল রয়েছে।[12]

আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) (ইন্তিকাল: ১০৫২হি:) এর বক্তব্য

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যা সায়্যিদা যাইনাব (রা.) এর ইন্তিকালের পর গোসলের শেষে তাঁর চাদর মুবারক যাইনাব (রা.) কে পরিধান করাতে নির্দেশ দেওয়ার হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেন,

وَهٰذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي التَّبَرُّكِ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ وَلِبَاسِهِمْ، كَمَا يَفْعَلُ بَعْضُ مُرِيدِي الْمَشَايِخِ مِنْ لُبْسِ أَقْمِصَتِهِمْ فِي الْقَبْرِ.

-এই হাদীস সালিহীনদের নিদর্শন ও তাঁদের পরিধেয় পোশাকের মাধ্যমে বরকত লাভের আছল (মূলভিত্তি)। যেমন; পীর-মাশায়িখদের মুরীদগণ তাদের পীরের পোশাক (ওসীয়তের মাধ্যমে কাফন হিসেবে) কবরে পরিধান করেন। [13]

আল্লামা নজম উদ্দিন আল গাজী আদ দামিস্কী (র.) (ইন্তিকাল: ১০৬১ হি:) এর বক্তব্য

তিনি বলেন,

وَكَذٰلِكَ يَنْبَغِي التَّبَرُّكُ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ، وَالْحِرْصُ عَلَى مَا عَسَى أَنْ يَحْصُلَ مِنْهُمْ مِنْ كِسْوَةٍ، أَوْ طَعَامٍ، أَوْ دَرَاهِمَ، أَوْ غَيْرِهَا، تَبَرُّكًا بِآثَارِهِمْ.

-অনুরূপভাবে, সালিহীনদের নিদর্শনসমূহের দ্বারা বরকত লাভ করা এবং তাঁদের নিদর্শনের মাধ্যমে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে তাঁদের নিকট হতে পোশাক, খাবার, দিরহাম অথবা অন্যান্য বস্তু পাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া উচিত।[14]

আল্লামা আবূ আব্দুল্লাহ আয যুরকানী (র.) (ইন্তিকাল: ১১২২ হি:) এর বক্তব্য

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যা সায়্যিদা যাইনাব (রা.) এর ইন্তিকালের পর গোসলের শেষে তাঁর চাদর মুবারক যাইনাব (রা.) কে পরিধান করাতে নির্দেশ দেওয়ার হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা আয যুরকানী (র.) বলেন,

وَهٰذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي التَّبَرُّكِ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ

-এই হাদীস সালিহীনদের নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে বরকত লাভের আছল (মূলভিত্তি)।[15]

শাইখ মাহমুদ খাত্তাব আস সুবকী (র.) (ইন্তিকাল: ১৩৫২হি:) এর বক্তব্য

তিনি আবূ যুহাইফা (রা.) বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযূর অবশিষ্ট পানির দ্বারা সাহাবায়ে কিরামের বরকত লাভের হাদীসের ব্যাখ্যায় শাইখ মাহমুদ খাত্তাব আস সুবকী (র.) বলেন,

وَدَلَّتْ بَقِيَّةُ الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ التَّبَرُّكِ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ.

-হাদীসের বাকি অংশ সালিহীনদের নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে বরকত লাভের বৈধতা প্রমাণ করে।[16]

ওহাবীদের মধ্যে যে ভ্রান্ত ধারণা ছড়িয়ে পড়েছে সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈনে ইযাম এবং তাঁদের নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে বরকত লাভ করা নিষিদ্ধ-এই বিষয়ে তাদের বিপক্ষে দলীল মুসলিম ইতিহাস জুড়ে হাদীস শাস্ত্রের ইমাম এবং হাদীসের হাফিযগণের এসব বক্তব্য। যা আপনার নিকট তাদের সেই ইলমী ঘাটতি উন্মোচণ করে যার উপর নির্ভর করে এ সম্প্রদায় আইম্মায়ে ইলিম এবং হাদীসের শারিহদের নির্লজ্জ বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে। তাছাড়া ইমামদের এসব উদ্ধৃতি আমাদের নিকট ওহাবীদের বিভ্রান্তির সামান্য কিছু স্পষ্ট করেছে; যে বিভ্রান্তিগুলো তারা তৈরি করেছে শিরকের দিকে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম মনে করে সালিহীনদের এবং তাঁদের নিদর্শনসমূহের ওসীলা ও তাবাররূক হারাম সাব্যস্ত করার জন্য।

তাহলে কি যুগ যুগ ধরে আইম্মায়ে কিরাম ও উলামাগণ শিরক কে বৈধতা দিতেছেন এবং হারামকে হালাল করেছেন? ওহাবীদের দৃষ্টিতে কি মুসলিম ইতিহাসের সকল ইমামগণ সালাফদের খিলাফ করেছেন? যদি এই ইমামগণ সালাফদের অনুসারী না হন তাহলে দুনিয়ার প্রতি সালাম!

যে ব্যক্তি এই ইমামগণের বিরোধিতা করে তার জন্য জানা আবশ্যক যে, সে সালাফদের বিরোধিতা করছে এবং আইম্মায়ে কিরাম, উলামা ও উম্মাহর আকীদা হতে বের হয়ে গেছে। অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাকে এই ভ্রান্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন যার মাধ্যমে সে মানুষের আকীদা নষ্ট করাকে বৈধ মনে করছে। মুসলমানদের কবর পূজারি হিসেবে আখ্যায়িত করতে ও সমাজে শিরক ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে বলতে এই ভ্রান্তিকে সিঁড়ি হিসেবে গ্রহণ করেছে। এরা এমন এক দল যাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার ভয়-ভীতি কম। তাছাড়া দ্বীন ও ইলমের সালাফ ইমামগণের তুরাসে ইলমী সম্পর্কেও তাদের প্রকৃত জ্ঞান অপ্রতুল।

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস-৩৭৬, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: সাহাবায়ে কিরামগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযূর পানি হতে বরকত লাভের জন্য প্রতিযোগিতা করতেন।

[2] আল লামিউস সবীহ বি শরহিল জামে' আস সহীহ, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১০৮

[3] গায়াতুন নিহায়াহ ফী তাবকাতিল কুররা, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৩

[4] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস-২৮৮৬, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাবির (রা.) অসুস্থ হলে তাঁকে দেখতে যান এবং তিনি যখন অসুস্থতার কারণে অজ্ঞান হয়ে যান তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযূ করে অবশিষ্ট পানি তাঁর উপর ছিটিয়ে দেন। অতঃপর তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে।

[5] শরহু সুনানে আবি দাউদ লি ইবনে রাসলান, খণ্ড: ১২, পৃষ্ঠা: ৪১৭

[6] ফতহুল বারী বিশারহিল বুখারী, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫৬৯

[7] সহীহ বুখারী, হাদীস:১২৫৮-১২৫৯

[8] উমদাতুল ক্বারী শরহু সহীহ আল বুখারী, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৪২

[9] আত তুহফাতুল লাতীফাহ ফী তারীখিল মাদীনাতিশ শারিফাহ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩০৬

[10] সহীহ বুখারী, হাদীস-২০৯৩

[11] ইরশাদুস সারী বি শরহে সহীহ আল বুখারী, খণ্ড:৩ পৃষ্ঠা:৩৫১

[12] মিনহাতুল বারী বি শারহিল সহীহ আল বুখারী, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৭৯

[13] লুম'আতুত তানকীহ ফী শরহে মিশকাতিল মাসাবীহ, খণ্ড: ০৪, পৃষ্ঠা: ১০৭

[14] হুসনুত তানাব্বুহ লিমা ওরাদা ফী তাশাব্বুহ, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৫৪৬

[15] শরহু মুয়াত্তা মালিক, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৭২

[16] আল মানহালুল আযবুল মাওরূদ শরহু সুনানি আবী দাউদ, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১৮৬

প্রবন্ধ

মক্কা চুক্তির ভূরাজনীতি

‘মুসলিম ন্যাটো’ ও বাংলাদেশের সম্ভাবনা

মারজান আহমদ চৌধুরী

গত ৭ আগস্ট সৌদি আরবের মক্কা মুকাররমায় সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তান একটি ত্রিপক্ষীয় যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করে, যা Makkah Agreement for Joint Defence নামে পরিচিত। সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান, তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোয়ান এবং পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ মক্কায় অনুষ্ঠিত বৈঠকের পর চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। তিন দেশের যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক সম্পর্ক, ইসলামী সংহতি, অভিন্ন কৌশলগত স্বার্থ ও পূর্ববর্তী প্রতিরক্ষা সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। চুক্তির মূল বিধান হলো, তিন দেশের যে কোনো একটির বিরুদ্ধে সংঘটিত সশস্ত্র হামলাকে তিনটি দেশের বিরুদ্ধেই হামলা হিসেবে গণ্য করা হবে (রয়টার্স, ১৩ আগস্ট)। ৩১ আগস্ট ইস্তাম্বুলে সৌদি, তুরস্ক ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানেরা প্রথম বৈঠকে অংশ নেন। বৈঠকে তিন দেশ মক্কা চুক্তির অধীনে সহযোগিতাকে আরও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, সৌদি আরবে একটি স্থায়ী সচিবালয় প্রতিষ্ঠা, প্রতিরক্ষা শিল্পে সহযোগিতা, যৌথ প্রযুক্তি উন্নয়ন, সশস্ত্র বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক প্রতিরক্ষা-সমন্বয় জোরদারের কথা বলা হয়।

কিছু আন্তর্জাতিক বিশ্লেষণ ও গণমাধ্যমে মক্কা চুক্তিকে ‘Muslim NATO’ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এর কারণ হলো চুক্তির মূল collective-defence clause, অর্থাৎ, স্বাক্ষরকারী তিন দেশের যেকোনো একটির বিরুদ্ধে সশস্ত্র হামলাকে তিন দেশের বিরুদ্ধেই হামলা হিসেবে বিবেচনা করার নীতি। এই নীতিটি বিশ্বের বৃহত্তম সামরিক জোট ন্যাটোর Article 5-এর সঙ্গে তুলনীয়। ন্যাটো (North Atlantic Treaty Organization) ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত একটি সামরিক ও রাজনৈতিক জোট, যার সদস্যরাষ্ট্রগুলো পারস্পরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। ন্যাটোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধান হচ্ছে Article 5, যেখানে বলা হয়েছে, কোনো একটি সদস্যরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকায় সশস্ত্র হামলাকে সব সদস্যের বিরুদ্ধে হামলা হিসেবে বিবেচনা করা হবে। ২০০১ সালে টুইন টাওয়ারে হামলার পর ন্যাটো প্রথমবারের মতো Article 5 এর কার্যকারিতা আহ্বান করে। এর ভিত্তিতে সদস্যরাষ্ট্রগুলো যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং আফগানিস্তান মার্কিন আগ্রাসনে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা প্রদান করেছিল। মক্কা চুক্তিকে ‘মুসলিম ন্যাটো’ বলার আরেকটি কারণ হচ্ছে চুক্তিবদ্ধ তিন দেশের সম্মিলিত সামরিক সক্ষমতা। তুরস্কের হাতে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সেনাবাহিনী ও নিজস্ব সামরিক সরঞ্জাম নির্মাণের সক্ষমতা রয়েছে। পাকিস্তান পারমাণবিক অস্ত্রধারী এবং সৌদি আরব বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ তেল উৎপাদক ও মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক শক্তি। তিন দেশ মিলিয়ে প্রায় ১৪ লাখ সক্রিয় সামরিক সদস্য, ৩,৪০০ বিমান, ৬,০০০ ট্যাংক এবং ৩৪০টির বেশি নৌযান রয়েছে (আল জাযিরা, ১১ আগস্ট)। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে তিনটি শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্রের এই চুক্তিকে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ‘মুসলিম ন্যাটো’ বলছে।

মক্কা চুক্তি কি আসলেই মুসলিম ন্যাটো? আমার কাছে এর জবাব হচ্ছে, না। প্রথমত, ন্যাটোকে শুধু সামরিক জোট মনে করলে এর মতাদর্শিক-রাজনৈতিক দিকটি বাদ পড়ে যায়। ন্যাটো স্নায়ুযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে গঠিত আমেরিকা ও ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর একটি নিরাপত্তা বলয়, যার লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রসার রুখে দেওয়া। মূলত ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর ন্যাটোকে তৈরি করা হয়েছিল ইউরোপের মাটিতে আমেরিকার স্থায়ী সামরিক উপস্থিতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে আমেরিকার বৈশ্বিক প্রভাব বজায় রাখতে। সোভিয়েতের পতনের পর ন্যাটো মহাসচিব উইলি ক্লেইস একটি জার্মান পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ‘ইসলামী মৌলবাদ’কে

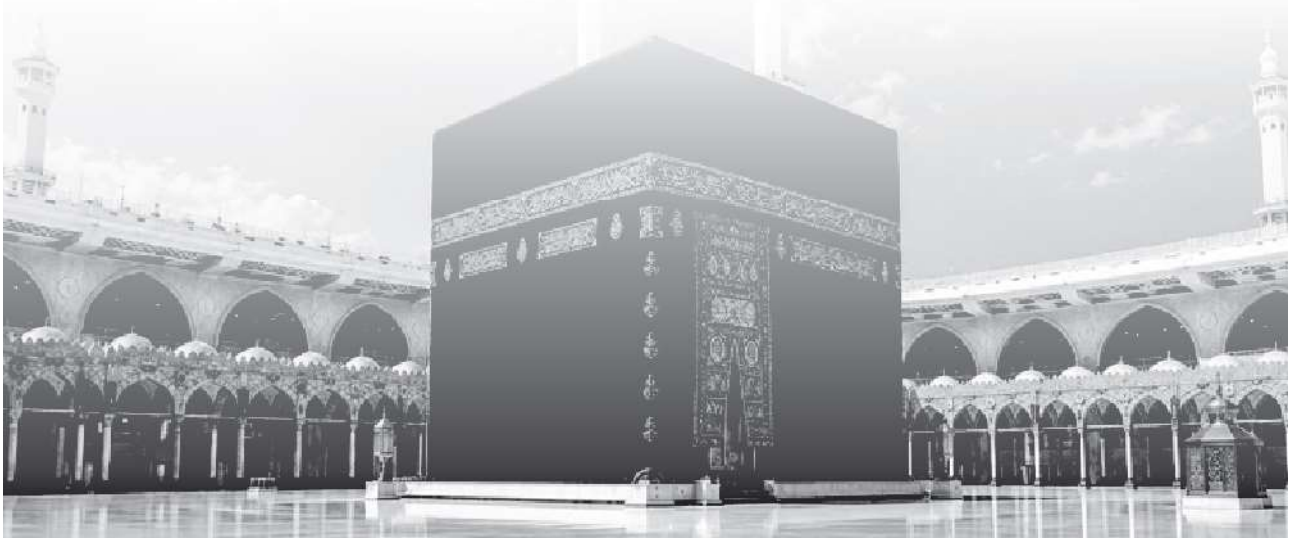

ন্যাটোর সবচেয়ে বড় হুমকি বলে আখ্যায়িত করেছিলেন (শিকাগো ট্রিবিউন, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫)। আজ ন্যাটোতে মুসলিম দেশ মাত্র দুটিঃ তুরস্ক ও আলবেনিয়া। তুরস্ক ১৯৫২ সালে ন্যাটোর সদস্য হয়, যখন দেশটি ছিল পুরোপুরি পাশ্চাত্যমুখী। এছাড়া সোভিয়েতকে ভূমধ্যসাগরে আসা থেকে বিরত রাখতে তুরস্ককে সাথে রাখা পশ্চিমাদের প্রয়োজন ছিল। আর বিশ্বরাজনীতিতে আলবেনিয়ার গুরুত্ব নিতান্তই কম। মোদ্দাকথা হলো, ন্যাটো একটি আমেরিকা-চালিত সামরিক জোট, যার অলিখিত লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বরাজনীতিতে পশ্চিম গোলার্ধের স্বার্থ সুরক্ষা ও প্রভাব বহাল রাখা। পক্ষান্তরে, মক্কা চুক্তিকে মোটেও আদর্শিক বা 'ইসলামী' জোট ভাবার সুযোগ নেই। একজন সৌদি অফিসিয়াল ইতোমধ্যে বিষয়টি টুইট করে জানিয়েছেন। এমনকি এই জোট ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তিন দেশের প্রতিরক্ষা জোটও নয়। তাই কেবল ন্যাটো-স্টাইলের একটি অনুচ্ছেদ জুড়ে দিলেই কেউ ন্যাটো হয়ে যায় না।

তাইলে প্রশ্ন আসে, সৌদি, তুরস্ক ও পাকিস্তানের এই চুক্তি করার প্রয়োজন পড়ল কেন? এর জবাবও তিন দেশের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন, যা একটু বিস্তারিত আলাপের দাবি রাখে। প্রথমে আসি সৌদি প্রসঙ্গে। সৌদি যুবরাজ বিন সালমান তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় চাপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। চাপ বহুমুখী। প্রথম চাপ আসছে আমেরিকা-ইসরায়েলের পক্ষ থেকে। আমেরিকা অবিরত সৌদিকে ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক নরমালাইজ করার চাপ দিয়ে যাচ্ছে। বিন সালমান তাতে সানন্দে রাযী ছিলেন। কিন্তু বাগড়া বেধেছে হামাসের তুফানে আকসা ও ইসরায়েল কর্তৃক গাযায় গণহত্যা। এ অবস্থায় অন্তত দেখানোর মতো কোনো বিনিময় ব্যতীত সৌদি যদি ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক নরমালাইজ করে, তাহলে তারা মুসলিম বিশ্বের আস্থা হারিয়ে ফেলবে। বিন সালমান চাইছিলেন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায়ের বিনিময়ে তিনি ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক নরমালাইজ করবেন এবং মুসলিম বিশ্বে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার মহানায়ক হিসেবে আবির্ভূত হবেন। কিন্তু ইসরায়েল বা আমেরিকা এই প্রস্তাবে পাত্তা দেয়নি। এজন্য সৌদি একপ্রকার থমকে আছে। দ্বিতীয় চাপ আসছে UAE তথা সংযুক্ত আরব আমিরাতের পক্ষ থেকে। সৌদি-আমিরাত সম্পর্কে সাম্প্রতিক টানাপোড়েন বেশ গভীর। প্রথমে দুই দেশ ইয়ামেনে হুথিদের ওপর একযোগে হামলা চালালেও পরে তাদের ইয়ামেন-নীতি পৃথক হয়ে যায়। সৌদি ইয়ামেনকে অখণ্ড রাখতে PLC সরকারকে সমর্থন জানায়। বিপরীতে আমিরাত দক্ষিণ ইয়ামানের STC-কে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে, যারা ইয়ামেনকে দ্বিখণ্ডিত করতে চায়। তবে ইয়ামেন-ইস্যু ছাড়িয়ে সৌদি-আমিরাতের মূল দ্বন্দ্ব হচ্ছে, উপসাগরীয় অঞ্চলে কে আমেরিকার সবচেয়ে আপন হবে, তা নিয়ে। কারণ আমেরিকাই তাদের নিরাপত্তা, অঢেল সম্পদ ও রাজতন্ত্র রক্ষার 'জামিনদার'। আপন দু'দেশই হতে চায়। তবে আমিরাতের কোনো পিছুটান নেই। মুসলিম উম্মাহ'র কাছে বিন যায়েদের কোনো জবাবদিহি নেই। নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য সুদানে RSF ও ইয়ামেনে STC-এর মতো শক্তিগুলোকে সামরিক সহায়তা দিতে বিন যায়েদ পিছপা হননি, যাদের কারণে সুদান ও ইয়ামেনে হাজারো মুসলমানের প্রাণ ঝরে গেছে। গাযায় চলমান গণহত্যার সময়ও আমিরাত ইসরায়েলকে সর্বোপরি সহযোগিতা করে যাচ্ছে। এমন নয় যে সৌদি বা আমিরাত ইসরায়েলকে পছন্দ করে। মূল কারণ হচ্ছে, ইসরায়েল হলো হোয়াইট হাউজ ও মার্কিন কংগ্রেসে ঢুকার প্রবেশপথ। আর, আমেরিকার রাজনীতি নিয়ে যাদের বিন্দুমাত্র ধারণা আছে তারা জানেন, ওয়াশিংটন ডিসির রাজনীতিতে AIPAC এর মতো ইসরায়েল-লবি কতটা প্রভাবশালী। তাই ইসরায়েল সন্তুষ্ট হলে আমেরিকাও সন্তুষ্ট। নিঃসন্দেহে আমিরাত এই দৌড়ে সৌদি থেকে এগিয়ে গেছে। তৃতীয় চাপ নিজের অর্থনীতির। পশ্চিমা বিনিয়োগকারীদের ভরসায় বিন সালমান সৌদিতে যেসব উচ্চাভিলাষী মেগাপ্রজেক্ট হাতে নিয়েছিলেন, বিনিয়োগের অভাবে প্রায় সবগুলোই থমকে গেছে। AGBI এর তথ্যানুযায়ী, সাম্প্রতিক যুদ্ধে সৌদি অর্থনীতি ৪.৮% সঙ্কুচিত হয়েছে। অবস্থা এমন যে, সৌদিকে এখন প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলারের ঋণ নিতে হচ্ছে (ব্লুমবার্গ, ৩১ আগস্ট)। চতুর্থ চাপ তৈরি হয়েছে আমেরিকা-ইসরায়েল কর্তৃক ইরানের ওপর আগ্রাসনের প্রেক্ষিতে। সাথে যুক্ত হয়েছে সৌদি-হুথি পালটাপালটি আক্রমণ। বিষয়টি খোলাসা করি। ইরান মধ্যপ্রাচ্যের সুন্নী রাষ্ট্রগুলোর জন্য হুমকি, এতে সন্দেহ নেই। সিরিয়া ও ইরাকে ইরান হাজার হাজার সুন্নী হত্যা করেছে। তাই ইরানের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা সৌদি প্রতিরক্ষানীতির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সেই সাথে রাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখা ও তেল বিক্রির গতি ধরে রাখার জন্যও সৌদির নিরাপত্তা প্রয়োজন। এই পর্যায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সৌদি কেন; দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সৌদির প্রয়োজন এমন একটি ছাতা, যা তাকে সার্বক্ষণিক সর্বোচ্চ সামরিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা করবে। এই প্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালে আমেরিকার সাথে সৌদির পেট্রো-ডলার চুক্তি হয়। খুব সরলভাবে বললে, এই চুক্তির ফলে সৌদি আন্তর্জাতিক বাজারে তার তেল ডলারের বিনিময়ে বিক্রি করতে এবং আমেরিকা সৌদির নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে সম্মত হয়। শুধু সৌদি নয়; উপসাগরীয় প্রতিটি আরব দেশ নিজেদের নিরাপত্তার জন্য আমেরিকার ওপর নির্ভরশীল। প্রসঙ্গত বলে রাখি, এই 'নিরাপত্তা' ব্যাপারটিও বেশ তর্কসাপেক্ষ। যেমন, ইসরায়েল কোনো আরব দেশে হামলা করলে আমেরিকা কখনও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ওই দেশকে নিরাপত্তা দেবে না। এই 'নিরাপত্তা' এজন্য, যেন ছোট ছোট ধনী আরব রাষ্ট্রগুলো একে অপরের ওপর হামলা না করে। তাই বলা যায়, মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকান সেনারা মূলত 'আর্মি' নয়; পুলিশের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। কিন্তু বাগড়া বেধেছে এবারের ইরান-আমেরিকা যুদ্ধ। আমেরিকা-ইসরায়েলের হামলার জবাবে ইরান উপসাগরীয় দেশগুলোতে অনবরত হামলা চালিয়েছে। এসময় আরবরা আমেরিকার কাছ থেকে যে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা আশা করছিল, আমেরিকা তার সিকিভাগও দেয়নি। যেন ট্রাম্পের মনোভাব হচ্ছে, আমরা ঘরের খেয়ে ইসরায়েলের মোষ তাড়াতে পারি, কিন্তু আরবদের মোষ তাড়াব কোন দুঃখে? অথচ সৌদি এতদিন ধরে আমেরিকার কাছে ন্যাটো-স্টাইলের একটি নিরাপত্তা নিশ্চয়তা চেয়ে আসছে। আমেরিকা তা করেনি। এখন সৌদি আবার হুথিদের সাথে লড়াইয়ে জড়িয়েছে। ২০২২ সালে হুথিদের সাথে সৌদির যুদ্ধবিরতি হয়েছিল। কিছুদিন আগে সানা বিমানবন্দরে সৌদি হামলার জবাবে এখন হুথিরা সৌদির দক্ষিণাঞ্চলে হামলা চালাচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ বাব আল-মান্দেব প্রণালীর নিরাপত্তাও নড়ে গেছে। এই সমস্ত চাপের পরিপ্রেক্ষিতে বিন সালমানের সবচেয়ে বড় কষ্টের জায়গা হচ্ছে আমেরিকা। বিপদের সময় আমেরিকা পাশে দাঁড়ায়নি। তবে কষ্ট থাকলেও ট্রাম্পকে চোখ রাঙানোর ক্ষমতা বিন সালমানের নেই। মোটাদাগে এই হচ্ছে সৌদির বর্তমান পরিস্থিতির একটি চিত্র।

এবার আসি তুরস্ক প্রসঙ্গে। প্রথমত, গ্রিস ও সাইপ্রাসকে সাথে নিয়ে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় ইসরায়েল নিজের বলয় শক্ত করছে, বিশেষত যেসব এলাকায় সাগরের নিচে বড় গ্যাসের মজুদ আছে। দ্বিতীয়ত,

ঐতিহাসিকভাবে লোহিত সাগরে অটোমানদের নৌ-উপস্থিতি ছিল, যা আজ নেই। ভূরাজনৈতিক বিশ্লেষক সামি হামদির মতে, এরদোয়ান চাচ্ছেন, লোহিত সাগরে নিজের নৌবাহিনী নিয়ে যাবেন। এমতাবস্থায় সৌদিকে নিরাপত্তা দেওয়ার প্রয়োজনে তিনি লোহিত সাগরে তুরস্কের নৌসেনা মোতায়েন করতে পারবেন। অর্থাৎ, তুরস্ক তার সামরিক সক্ষমতাকে সৌদির ভৌগোলিক সুবিধার সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করতে চাচ্ছে। সামির মতে, এরকম একটি জোট করার প্রস্তাব সম্ভবত তুরস্ক দিয়ে আসছিল। বিন সালমান তাতে রাযী হননি, যেহেতু তিনি সৌদির 'ইসলামী পরিচয়' ঝেড়ে ফেলতে উৎসাহী ছিলেন। আজ বাধ্য হয়েই তিনি রাযী হয়েছেন। সেইসাথে চুক্তি স্বাক্ষরের স্থান হিসেবে তিনি রাজধানী রিয়াদের পরিবর্তে মক্কা শরীফকে বেছে নিয়েছেন, যাতে মক্কার দ্বীনী গুরুত্বকে কাজে লাগানো যায়। ছবিতে দেখা গেছে, আল-সাফা প্যালেসে বিন সালমান, এরদোয়ান ও শাহবাজ দাঁড়িয়ে আছেন। ঠিক পেছনে হারামের উঁচু মিনারাত দেখা যাচ্ছে। প্রতীকী (Symbolism) দিক থেকে দেখলে, এটি নিঃসন্দেহে একটি বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল ছিল।

এবার আসি পাকিস্তান প্রসঙ্গে। গতবছর ভারতীয় হামলার (অপারেশন সিঁদুর) শক্ত জবাব দিয়ে এবং চলতি বছর ইরান-আমেরিকার মধ্যস্ততা করে বিশ্বমঞ্চে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিয়ে যাওয়া পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন এখন অর্থ। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পাক ইকোনমিকে খারাপভাবে আঘাত করেছে। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, পাকিস্তানের চাবিকাঠি কেবল সরকারের হাতে নয়। পাক ক্ষমতার মূল কলকাঠি সেনাবাহিনী, বা স্পষ্ট করে বললে সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের হাতে। আসিম হয়তো একসময় নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করবেন, যেভাবে মিসরের জেনারেল সিসি করেছেন। তবে পাকিস্তানের চলমান অর্থনৈতিক দৈন্যদশার মধ্যে তিনি নিজের কাঁধে দেশের পুরো দায়িত্ব নেবেন বলে মনে হয় না। তাই মক্কা চুক্তির ফলে যদি সৌদি ও তুরস্কের দ্বারা পাকিস্তানে অন্তত সামরিক সহায়তা আসে, তাইলে পাকিস্তানেরও লাভ; জেনারেল আসিমেরও লাভ। মোটকথা হচ্ছে, সৌদির অর্থ ও ভৌগোলিক সুবিধা আছে; প্রযুক্তি ও জনদক্ষতা নেই। তুরস্কের প্রযুক্তি ও জনদক্ষতা আছে; তবে কিছু ক্ষেত্রে ভৌগোলিক সুবিধা প্রয়োজন। অপরদিকে পাকিস্তানের সামরিক সক্ষমতা আছে; প্রয়োজন অর্থ। এবার যার যা নেই, তা পূরণ করার চেষ্টা করছে। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আমেরিকা এই জোটকে কীভাবে নিচ্ছে? ট্রাম্প ইতোমধ্যেই মক্কা চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন। তার বার্তা পড়ে বুঝা যায়, তিনি এটিকে ইরানের বিরুদ্ধে জোট মনে করছেন এবং তিনি উৎফুল্ল যে, সৌদির নিরাপত্তার ভার আমেরিকার কাঁধ থেকে কিছুটা নেমেছে! এছাড়া এরদোয়ান, শাহবাজ ও আসিমের সাথে ট্রাম্পের সম্পর্ক বেশ উষ্ণ। তাই ট্রাম্প হয়তো এদেরকে সন্দেহ করার মতো কিছু পাননি।

আরেকটি কারণে আমি মক্কা চুক্তিকে 'মুসলিম ন্যাটো' মনে করি না। তা হচ্ছে, কেউ পরিষ্কার করে বলছে না যে, এই জোট কার বিরুদ্ধে গঠন করা হয়েছে। না এটি ইরানের বিরুদ্ধে, না ইসরায়েলের, না ভারতের, না অন্য কারও। পাক ও তুর্কি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এটিকে কেবল 'প্রতিরক্ষা কাঠামো' হিসেবে উল্লেখ করেছে। এরকম অস্পষ্ট লক্ষ্যের একটি জোটকে কীভাবে ন্যাটোর সাথে তুলনা করা যায়? তাই আটলান্টিক কাউন্সিলের বিশ্লেষক ড. ওয়েন উনলুহিসারচিক্লি এটিকে "ন্যাটোর সাথে তুলনীয় পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি নয়, বরং কৌশলগত সমন্বয়ের কাঠামো" বলে বর্ণনা করেছেন। তাইলে এই জোট কি একেবারে অর্থহীন? না, সেটি মোটেও বলছি না। উদ্দেশ্য ভালো হলে এই জোট এবং পরবর্তীতে স্বাক্ষরকারী অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোকে সাথে নিয়ে মুসলিম বিশ্বের বহু সমস্যা সমাধান করা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

মক্কা চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার এই জোটে যোগদানের ব্যাপারে আলাপ উঠেছে। বাংলাদেশ নিজের আগ্রহের কথা জানালেও মালয়েশিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি। যদিও মক্কা চুক্তি কোনো আদর্শিক মুসলিম জোট কিংবা ন্যাটো-স্টাইলের নিরাপত্তা বলয় নয়; এমনকি এর ভবিষ্যত সাফল্য নিয়েও সন্দিহান হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে; তবুও আমি মনে করি বাংলাদেশকে এই জোটে যোগদান করার ব্যাপারটি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত। প্রথমে বাংলাদেশকে খুব সতর্ক থাকা প্রয়োজন যে, এই জোট যেন মধ্যপ্রাচ্যের সুন্নী-শীআ দ্বন্দ্বের নতুন সংযোজন না হয়। কারণ বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনেক বিশ্লেষক এটিকে 'ইরান-বিরোধী প্রতিরোধ' হিসেবে দেখছেন। এমনটি হলে, বাংলাদেশকে নিজেকে সরিয়ে রাখা আবশ্যক। মধ্যপ্রাচ্যের স্বার্থবাদী ভূরাজনৈতিক লড়াইয়ে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ করার কোনো মানে নেই। এই সতর্কতা উচ্চারণ করার পর বলছি, আমি মনে করি, বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া প্রমুখ রাষ্ট্রগুলো মক্কা চুক্তিতে স্বাক্ষর করলে এই জোটের প্রকৃত কার্যকারিতা প্রসারিত হবে। দুটি উদাহরণ দিচ্ছি। উদাহরণগুলোকে অধিক সরলীকরণ মনে হতে পারে; তবে এখানে এরচেয়ে গভীরে যাওয়ার সুযোগও নেই। প্রথমত, বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নাগরিকত্ব ও প্রত্যাবাসনের প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত। মিয়ানমার সরকার কিছু ব্যক্তিকে রাখাইন রাজ্যের সাবেক বাসিন্দা হিসেবে যাচাই করলেও প্রত্যাবাসনের শর্ত এখনও সমাধান হয়নি। রাখাইন রাজ্যে মায়ানমার আর্মি স্থানীয় আরাকান আর্মির সাথে লড়াই করছে। তাদের মধ্যকার আলোচনায়ও বাংলাদেশ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এখানে বলে রাখা উচিত, রাখাইন রাজ্যে চীনের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক স্বার্থ জড়িত আছে। মালাক্কা প্রণালীকে পাশ কাটিয়ে মধ্যপ্রাচ্য থেকে জ্বালানি আমদানি করতে চীন বঙ্গোপসাগর থেকে মায়ানমার হয়ে পাইপলাইন স্থাপন করছে। যদিও মক্কা চুক্তির এখন পর্যন্ত নিজস্ব কোনো কূটনৈতিক ম্যাকানিজম নেই বা রোহিঙ্গা ইস্যু তাদের ম্যান্ডেটের মধ্যে নেই, তবে বাংলাদেশ চাইলে জোটের সদস্যরাষ্ট্রগুলোর প্রভাবকে ব্যবহার করে এই নতুন প্লাটফর্মটিকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ইস্যুতে একটি 'সম্পূরক কূটনৈতিক চ্যানেল' হিসেবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে পারে। আমার মতে, এটি হবে বাংলাদেশের সেরা সুযোগ। দ্বিতীয়ত, জোটের অন্যতম সদস্য তুরস্কের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি নিয়ে সহযোগিতার আলোচনা এগিয়েছে। আবার মক্কা চুক্তির আওতায় সৌদি, তুরস্ক ও পাকিস্তান প্রতিরক্ষা শিল্পে সহযোগিতা ও যৌথ প্রযুক্তি উৎপাদনের বিষয়ে সম্মত হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ যদি তুরস্কের মাধ্যমে এই বৃহত্তর প্রতিরক্ষা-শিল্প সহযোগিতার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়, তাহলে তা বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। সরকার নিশ্চয়ই বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে। এই লেখাটি কেবল পাঠকের জন্য, যারা মুসলিম বিশ্বের তিনটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের একত্রে এগিয়ে আসা দেখে উৎসাহ বোধ করছেন। শেষকথা এটিই যে, মক্কা চুক্তি এখনই ন্যাটো সমতুল্য নয়। তবে তার মানে এই নয় যে, এর কোনো গুরুত্ব নেই। বরং চাইলে এই জোট নিজেদের নিরাপত্তার পাশাপাশি অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রকে সাথে নিয়ে মুসলিম বিশ্বের বেশ কিছু সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা রাখে।

প্রবন্ধ

শাইখ আব্দুল কাদির জিলানী (র.)
জীবন, দর্শন ও উত্তরাধিকার

মুহাম্মাদ হুসাইন

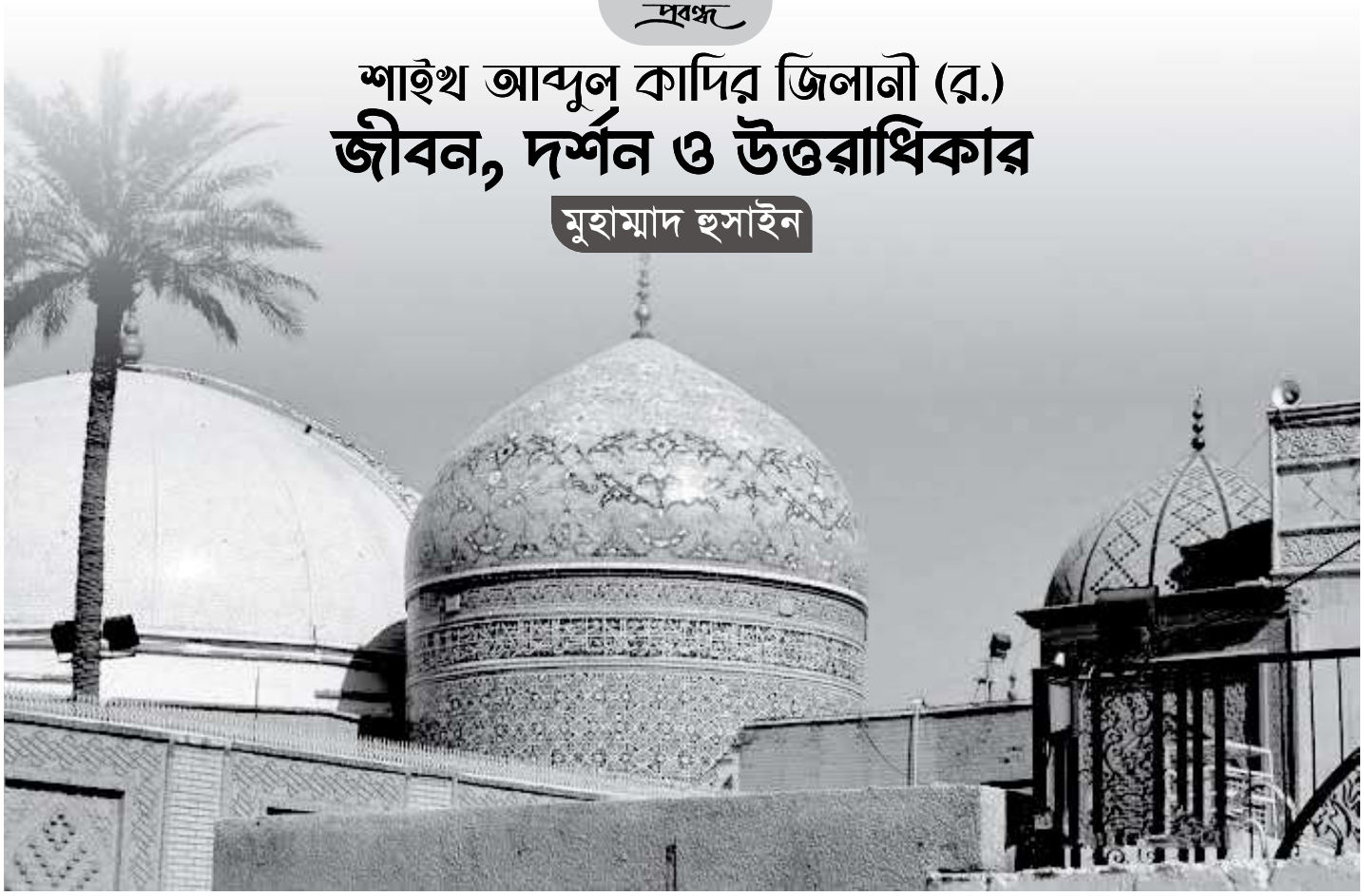

ইসলামের ইতিহাসে যত প্রভাবশালী মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে, এসবের মধ্যে আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর নাম অত্যন্ত উজ্জ্বল। তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি একাধারে জ্ঞানচর্চা, আত্মশুদ্ধি, নৈতিক সংস্কার, দাওয়াত ও জনকল্যাণের বিভিন্ন ধারাকে প্রভাবিত করেছেন বিপুলভাবে। ইসলামের মৌলিক জ্ঞানক্ষেত্র তথা তাফসীর, হাদীস, ফিকহ সবক্ষেত্রে তার গভীর পারদর্শিতা তাকে তার সময়ের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। বিশেষত, তাসাউফের ক্ষেত্রে তার অনন্য উচ্চতায় আরোহণের কারণে তিনি সমগ্র মুসলিম বিশ্বে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জীবন্ত হয়ে আছেন।

তবে শাইখ আব্দুল কাদির জিলানীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব শুধু তার তাসাওউফচর্চা বা কারামাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং তার বিশেষত্ব ছিল ইসলামী শরীআতের বিধান ও তাসাউফের আত্মিক শিক্ষাকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন না করে একটি সমন্বিত জীবনদর্শনের মারফতে উপস্থাপন করা। তার বক্তব্য ও শিক্ষায় বাহ্যিক আমল, অন্তরের পরিশুদ্ধি, নফসের নিয়ন্ত্রণ, আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল, মানুষের প্রতি সদাচরণ এবং শরীআতের আনুগত্য একই নৈতিক কাঠামোর অংশ হয়ে ওঠে।

> **ইসলামী জ্ঞান-ঐতিহ্যে আউলিয়ার কারামাত একটি স্বীকৃত ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়। তবে ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে কোনো কারামাতের বর্ণনা গ্রহণের সময় তার সনদ, বর্ণনাকারী, গ্রন্থের রচনাকাল এবং ঘটনাটির প্রাথমিক উৎস বিবেচনা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ইমাম শাইখ আব্দুল কাদির (র.) এর কারামত সংক্রান্ত বর্ণনাগুলোর বিশেষত্ব হলো, এর বিরাট একটি অংশ সনদসহ বর্ণিত হয়েছে।**

পরবর্তী সময়ে তার শিক্ষা ও নামে প্রচলিত কাদিরিয়্যাহ তরীকা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত হয়। ফলে শাইখ জিলানী (র.)-এর প্রভাব একটি নির্দিষ্ট শহর বা যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তার নামে গড়ে ওঠা আধ্যাত্মিক ও শিক্ষাগত ঐতিহ্য বহু শতাব্দী ধরে মুসলিম সমাজে কার্যকর থেকেছে।

চলমান নিবন্ধে তার জীবনেতিহাসের বিশেষ দিক তথা জ্ঞানচর্চা, তালীম-তাদরিস, তাসাওউফের ধারণা, সামাজিক সংস্কার ও বৌদ্ধিক উত্তরাধিকার— ইত্যাদি ব্যাপারে আলোচনা করা হবে।

জন্ম, পরিবার ও বংশপরিচয়

শাইখ আবদুল কাদির জিলানী (র.)-এর পূর্ণ নাম আবূ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির ইবন আবূ সালিহ মূসা আল-জিলানী। জীবনীগ্রন্থে তার বংশপরিচয় নিয়ে কিছু মতপার্থক্য পাওয়া যায়। একটি ঐতিহ্যে তাঁকে পিতৃসূত্রে ইমাম হাসান (রা.)-এর বংশধর বলা হয়েছে। অন্য

কিছু সূত্রে তার বংশকে ইমাম হুসাইন (রা.)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে। আবার পরবর্তী কিছু জীবনীকার উভয় ধারার সমন্বয় করে পিতৃ-মাতৃসূত্রে হাসানী-হুসাইনী বংশোদ্ভূত হিসেবে তাকে উল্লেখ করেছেন।

তার মাতার নাম ফাতিমা উম্মুল খাইর বিনতে আবদুল্লাহ আল-সাওমাঈ। পিতার নাম আবূ সালিহ মূসা। তার পারিবারিক পরিবেশে ধর্মীয় অনুশীলন, ইবাদত, পরহেজগারী ও আত্মসংযমের চর্চা ছিল বলে জীবনীকারদের বর্ণনায় পাওয়া যায়। বিশেষত, তার মাতামহ আবদুল্লাহ আল-সাওমাঈ ইবাদত ও রিয়াযতের জন্য সবিশেষ পরিচিত ছিলেন।

এ ধরনের পারিবারিক পরিবেশ তার শৈশবের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পরবর্তী জীবনে তার মধ্যে যে আত্মসংযম, দুনিয়াবিমুখতা, ইবাদতনিষ্ঠা ও নৈতিক দৃঢ়তা দেখা যায়, তার প্রাথমিক ভিত্তি এই পারিবারিক পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে ধারণা করা যায়।

তার জন্মসাল নিয়েও ঐতিহাসিক সূত্রে ভিন্নতা আছে। অধিকাংশ বর্ণনায় ৪৭০ বা ৪৭১ হিজরীর কাছাকাছি সময়ের কথা বলা হলেও কিছু সূত্রে ভিন্ন সাল উল্লেখ করা হয়েছে। জন্মস্থান হিসেবে জিলান বা গিলান অঞ্চল সর্বাধিক পরিচিত। এ অঞ্চলটির সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার কারণেই তার নামের সঙ্গে আল-জিলানী বা আল-গিলানী নিসবত যুক্ত হয়।

শৈশব ও প্রাথমিক তারবিয়াত

শাইখ জিলানী (র.)-এর শৈশব সম্পর্কে তার জীবনীগ্রন্থগুলোতে বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। রামাদান মাসে তার দিনের বেলায় দুধ পান না করার মতো ঘটনাও তার শৈশবের কারামাত হিসেবে মশহুর। তাছাড়া শৈশবে তিনি এমন একটি পরিবারে বেড়ে ওঠেন যেখানে ধর্মীয় অনুশাসন ও আত্মসংযমকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এটি শিশু কালেই তাকে বিশেষভাবে প্রাভাবিত করেছিল। অল্প বয়সেই তার মধ্যে জ্ঞানার্জনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়। সে সময় মুসলিম বিশ্বের অন্যতম প্রধান জ্ঞানকেন্দ্র ছিল বাগদাদ। ফলে উচ্চতর ইসলামী জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি বাগদাদে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

বাগদাদে আগমন ও জ্ঞান অন্বেষনের নতুন অধ্যায়

৪৮৮ হিজরীতে প্রায় আঠারো বছর বয়সে তিনি বাগদাদে প্রবেশ করেন। তার এই বাগদাদ আগমন ছিল তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাঁকগুলোর একটি। কারণ বাগদাদ তখন শুধু রাজনৈতিক রাজধানী নয় বরং ফিকহ, হাদীস, তাফসীর, আরবী ভাষা, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানচর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।

শাইখ জিলানী (র.) সেখানে এসে একাধিক বিশিষ্ট আলিমের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। হাদীসের ক্ষেত্রে কয়েকজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসের কাছ থেকে তিনি জ্ঞান অর্জন করেন। ফিকহে তিনি বিশেষভাবে হাম্বলী মাযহাবের আলিমদের সান্নিধ্য লাভ করেন। আবূ আল-ওফা আলী ইবন আকীল, আবূ খাত্তাব মাহফূয ইবন আহমদ এবং আবূ সাঈদ মুবারক আল-মুখাররিমী প্রমুখ তাঁর শিক্ষাজীবনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে ইতিহাসগ্রন্থগুলোতে উল্লিখিত হয়েছেন। তার জ্ঞানচর্চা শুধু একটি বিশেষ শাস্ত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। ফিকহের পাশাপাশি হাদীস, কুরআনের পাঠ ও তাফসীর, আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং বিভিন্ন মতপার্থক্যপূর্ণ ফিকহী বিষয়ে তিনি জ্ঞান অর্জন করেন। তার পরবর্তী ফতোয়া ও শিক্ষাদানের বহুমাত্রিকতা থেকেই বোঝা যায় যে তিনি একটি বিস্তৃত ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে নিজেকে প্রস্তুত করে গড়ে তুলেছিলেন।

জ্ঞানার্জনের সংগ্রাম ও দারিদ্র্য

শাইখের শিক্ষাজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল কঠোর আর্থিক সংকট। জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে যখন গৃহ ছাড়েন, পরিবার থেকে নিয়ে আসা অর্থ-সম্পদ দ্রুত শেষ হয়ে যায়। ফলে বাগদাদের মতো ব্যয়বহুল নগরে দীর্ঘদিন অবস্থান করে নিয়মিত শিক্ষা গ্রহণ করা তার জন্য সহজ ছিল না। এসময়ে তার খাদ্যাভাব, অনাহারের মুখোমুখি হতে হয়। এসব অভিজ্ঞতা তার জীবনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক মাত্রা দেয়। জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি আরাম-আয়েশ ত্যাগ করেছিলেন—এটি তার জীবনের একটি সুপ্রমাণিত বিষয়। তবে তার জীবনের প্রারম্ভিক স্তরের দারিদ্র্যকে শুধু কষ্টের ইতিহাস হিসেবে দেখলে তার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক অনালোচিত থেকে যায়। অভাব তার মধ্যে আত্মনির্ভরতা, সংযম, ধৈর্য এবং মানুষের দুঃখের প্রতি সহমর্মিতা সৃষ্টি করেছিল—এমন ব্যাখ্যা পরবর্তী বর্ণাঢ্য জীবনের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ।

হাম্মাদ আদ-দাব্বাস ও আধ্যাত্মিক তারবিয়্যাত

শাইখ জিলানী (র.)-এর তাসাওউফ-জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন হাম্মাদ আদ-দাব্বাস। তার সাহচর্যে শাইখ জিলানী (র.) আত্মসংযম, নফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, ধৈর্য এবং আধ্যাত্মিক সাধনার বিভিন্ন পর্যায়ের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তার মুর্শিদ হাম্মাদ আদ-দাব্বাসের প্রশিক্ষণ ছিল কঠোর প্রকৃতির। জিলানী (র.)-এর প্রতি তার কঠোর আচরণ সম্পর্কে বহু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত এসব ঘটনার পেছনে একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। তা হলো, মুরীদের আত্মকেন্দ্রিকতা, অহংকার ও আরামের প্রবণতা ভেঙে তাকে ধৈর্য ও আত্মসংযমের পথে পরিচালিত করা।

শাইখের আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে নির্জনতা, রাত্রিজাগরণ, ক্ষুধা সহ্য করা, নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং নিয়মিত যিকর চর্চার কথা পাওয়া যায়। তবে তার পরবর্তী জীবনের ইতিহাসে দেখা যায় যে এই সাধনা তাকে সমাজবিমুখ কোন আচার-আচরণ সর্বস্ব জীবনবোধের দিকে নিয়ে যায়নি। বরং নির্জন সাধনার পর তিনি ব্যাপক সামাজিক ও শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে ফিরে আসেন। এখানেই তার তাসাওউফের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয় যে, আত্মশুদ্ধি সমাজ থেকে পালিয়ে যাওয়ার বৈধতা বিধায়ক নয়; বরং নিজেকে পরিশুদ্ধ করে মানুষের কল্যাণে অধিক কার্যকর হওয়ার প্রস্তুতি।

মাদরাসা, ওয়ায, দ্বীনী শিক্ষাবিস্তার ও দাওয়াত-সংস্কারের সামাজিক আন্দোলন

বাগদাদে 'বাবুল আযজ' নামে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষাকেন্দ্র ছিলো যা সাঈদ আল-মুখাররিমীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো। সাঈদ আল-মুখাররিমীর ইন্তিকালের পর শাইখ জিলানী (র.) এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি ব্যাপক সম্প্রসারিত করা হয়।

৫২৮ হিজরীর কাছাকাছি সময়ে এই শিক্ষাকেন্দ্রের সম্প্রসারণের কথা বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়। এতে মসজিদ, মাদরাসা, আবাসন ও খানকাহধর্মী কার্যক্রমের সমন্বয় ঘটেছিল বলে উল্লেখ করা হয়। তার শিক্ষাদান ছিল বহুমুখী। তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, বিভিন্ন মাযহাবের মতামত, ইখতিলাফ, আরবী ব্যাকরণ এবং ধর্মতত্ত্ব—বিভিন্ন বিষয় তার পাঠদানের আওতায় ছিল।

তিনি ফিকহের একজন উচ্চস্তরের আলিম এবং ফাতওয়া প্রদানের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে সমসাময়িকদের কাছে পরিচিত ছিলেন এবং হাম্বলী ফিকহে বিশেষভাবে পারদর্শী ছিলেন। একই সঙ্গে শাফিঈ ফিকহের বিষয়েও তার অগাধ জ্ঞান ছিল।

ফাতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে উভয় মাযহাবের মতামত সম্পর্কে তার অবগতির কথা ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন।

বিদ্যায়তনিক পরিসরে শাইখ জিলানী (র.)-এর প্রভাব বোঝার অন্যতম প্রধান উপায় হলো তার ছাত্র ও শিষ্যদের পরবর্তী কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করা। তার সঙ্গে সম্পর্কিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে মুওয়াফফাকুদ্দীন ইবন কুদামাহ, আবদুল গনী আল-মাকদিসী, আবদুল করীম আস-সামআনী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ইবন কুদামাহ পরবর্তীকালে হাম্বলী ফিকহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হন এবং তার বিখ্যাত গ্রন্থ আল-মুগনী ইসলামী ফিকহের ইতিহাসে বিশেষ মর্যাদা লাভ করে।

ওয়াযের ক্ষেত্রেও ছিল তার বিস্তৃত জনসম্পৃক্ততা। সেখানে শুধু সূফী মুরীদ নয়; আলিম, শিক্ষার্থী, সাধারণ মানুষ এবং বিভিন্ন শ্রেণির লোক উপস্থিত হতেন। এই ব্যাপক জনসম্পৃক্ততা তার দাওয়াতকে একটি বৃহৎ সামাজিক আন্দোলনের রূপ দেয়।

তার দাওয়াতের বিশেষত্ব হলো— তিনি শ্রোতার আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব নৈতিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতেন। একজন মানুষ মসজিদে ইবাদত করবে, কিন্তু বাজারে প্রতারণা করবে—এ ধরনের দ্বৈততাকে তার শিক্ষার কাঠামো সমর্থন করে না। তার শিক্ষায় আত্মশুদ্ধি মানে শুধু ব্যক্তিগত ইবাদত বৃদ্ধি নয় বরং আচরণ, অর্থনৈতিক লেনদেন, সামাজিক সম্পর্ক এবং দায়িত্ববোধের উন্নয়নও এর অন্তর্ভুক্ত। সামগ্রিকভাবে তার ওয়ায-নসীহতের উদ্দেশ্য ছিলো মুসলিম জীবনের নৈতিক পুনর্গঠনের সদৃঢ় ও পুনরাবৃত্ত উচ্চারণ।

ক্ষমতাকেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক

শাইখ জিলানী (র.) শাসক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাকেন্দ্র থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। তার এ অবস্থানের কারণ ছিল নৈতিক স্বাধীনতাবোধ। তিনি মনে করতেন, আলিমের দায়িত্ব ক্ষমতাসীন ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ বা তোষামুদে প্রশংসা করা নয়; বরং প্রয়োজন হলে তাদের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায়ের কথা বলা। এজন্য শাইখের জীবনীতে খলীফাদের সঙ্গে তার কথোপকথন এবং তাদের নৈকট্য প্রত্যাখ্যানের বিভিন্ন ঐতিহাসিক মুহূর্তের বিবরণ পাওয়া যায়। এর স্পষ্ট দৃষ্টান্ত হলো আব্বাসী খলীফার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তার উচ্চকণ্ঠ হওয়ার ঘটনা। একবার আব্বাসী খলীফা আল-মুকতাফি লি-আমরিল্লাহ-এর সময়ে একজন বিতর্কিত ব্যক্তিকে বিচারক পদে নিয়োগ দেওয়া হলে শাইখ জিলানী (র.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে খলীফাকে উদ্দেশ করে বলেন—

وَلَّيْتَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَظْلَمَ الظَّالِمِينَ، مَا جَوَابُكَ غَدًا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ؟

-আপনি মুসলমানদের ওপর যালিমদের মধ্যে সবচেয়ে যালিম ব্যক্তিকে নিয়োগ দিয়েছেন। আগামীকাল রাব্বুল আলামীনের সামনে এর কী জবাব দেবেন? (মিরআতুয যামান, সিবত ইবনিল জাওযী, ৮/২৬৫)

তিনি দুনিয়ার ক্ষমতা কেন্দ্র থেকে দূরে থেকে নিজেই হয়ে উঠেছিলেন বিরাট ক্ষমতার ভরকেন্দ্র। ইতিহাসে তার এই অবস্থানের স্বীকৃতি উচ্চারিত হয়েছে এভাবে—

مَا أَلَمَّ بِبَابِ حَاكِمٍ قَطُّ.

-তিনি কখনো কোনো শাসকের দরজায় উপস্থিত হননি। (কালাইদুল জাওয়াহির, ইউসুফ আন নাবহানী)

শাইখের এরকম অবস্থানের মধ্য দিয়ে এই আদর্শটিই প্রকাশ পায় যে, ধর্মীয় নেতৃত্ব যেন রাজনৈতিক ক্ষমতা ও বস্তুগত সুবিধার ওপর নির্ভরশীল না হয়। তার এমন নৈতিক দৃঢ়টা, সমকালীন লোকদের মধ্যে তার বিশেষ জনপ্রিয়তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে থাকবে— নিসন্দেহে বলা যায়।

কাদিরিয়্যাহ তরীকার বিকাশ

শাইখ আবদুল কাদির জিলানী (র.)-এর চিন্তাদর্শন ও কর্মধারার ভিত্তিতে পরবর্তীকালে যে সূফী-তরীকা গড়ে ওঠে তা হলো কাদিরিয়্যাহ। তার জীবদ্দশায় পরবর্তী যুগের মতো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোবদ্ধ তরীকা ছিল কি না—এটি ঐতিহাসিকভাবে আলাদা আলোচনার বিষয়। তবে তার শিক্ষা, খানকাহ-কার্যক্রম, শিষ্যমহল ও আধ্যাত্মিক সিলসিলা পরবর্তী সময়ে একটি সুসংগঠিত তরীকার ভিত্তি তৈরি করে। এটিই কাদিরিয়্যাহ তরীকা নামে পরিচিত। এই ধারার মূল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে শরীআতের আনুগত্য, যিকর, আত্মশুদ্ধি, আখলাক, দরিদ্রের প্রতি সহমর্মিতা এবং দুনিয়ামোহ থেকে অন্তরের স্বাধীনতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার এই তরীকার মৌলদর্শন হলো আল্লাহর ভয়, আনুগত্য, শরীআতের সীমারক্ষা, কলব পবিত্রকরণ, দানশীলতা, দয়া, ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতার চর্চা ও প্রসার।

রচনাবলি

তার নামে বেশ কিছু গ্রন্থ প্রচলিত। তবে তার নামে সম্পৃক্ত প্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রামাণিকতা একই মাত্রায় ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। শাইখের সর্বাধিক পরিচিত রচনাগুলোর মধ্যে রয়েছে:

الْغُنْيَةُ لِطَالِبِي طَرِيقِ الْحَقِّ (আল-গুনইয়াহ লি-তালিবি তারীকিল হক): এটা তার নামে সবচেয়ে পরিচিত গ্রন্থগুলোর একটি। এতে ইবাদত, আকীদা, ফিকহ, নৈতিকতা ও আত্মশুদ্ধি বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যায়।

فُتُوحُ الْغَيْبِ (ফুতূহুল গায়ব): এটি মূলত আধ্যাত্মিক উপদেশ ও আত্মশুদ্ধিমূলক বক্তব্যের সংকলন হিসেবে পরিচিত। আল্লাহর ওপর নির্ভরতা, নফসের নিয়ন্ত্রণ, বিপদের সময় ধৈর্য এবং আত্মসমর্পণের মতো বিষয় এতে গুরুত্ব পেয়েছে।

الْفَتْحُ الرَّبَّانِيُّ وَالْفَيْضُ الرَّحْمَانِيُّ (আল ফাতহুর রাব্বানী): এটি তার বক্তৃতা ও নসীহতমূলক মজলিসের সংকলন হিসেবে পরিচিত। এতে তার জনসম্মুখের দাওয়াতী ভাষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়।

এ ছাড়া সিররুল আসরারসহ আরও কয়েকটি গ্রন্থ তার নামে প্রচলিত। তবে এসব গ্রন্থের ক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপি-ইতিহাস, সংরক্ষণ ও পরবর্তী সংযোজনের প্রশ্ন নিয়ে পৃথক ও বিশেষায়িত গবেষণা প্রয়োজন।

কারামাতের বর্ণনা ও ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্য

শাইখ জিলানী (র.)-এর জীবনীতে কারামাতের অসংখ্য বিবরণ পাওয়া যায়।

ইসলামী জ্ঞান-ঐতিহ্যে আউলিয়ার কারামাত একটি স্বীকৃত ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়। তবে ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে কোনো কারামাতের বর্ণনা গ্রহণের সময় তার সনদ, বর্ণনাকারী, গ্রন্থের রচনাকাল এবং ঘটনাটির প্রাথমিক উৎস বিবেচনা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ইমাম শাইখ আব্দুল কাদির (র.) এর কারামত সংক্রান্ত বর্ণনাগুলোর বিশেষত্ব হলো, এর বিরাট একটি অংশ সনদসহ বর্ণিত হয়েছে। ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবীর সিয়ারু আলামিন নুবালা কিংবা তারিখুল ইসলাম এর মত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে এসবের ব্যাপারে বিস্তর বিবরণ পাওয়া যায়।

ব্যক্তিজীবনের বৈশিষ্ট্য

জীবনীকারদের বর্ণনায় জানা যায়, শাইখ জিলানী (র.) ছিলেন অত্যন্ত সংযমী, দানশীল ও বিনয়ী। তিনি দরিদ্রদের সঙ্গে বসতেন এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আচরণ করতেন।

তার দুনিয়াবিমুখতা ছিল সম্পদকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার অর্থে নয়; বরং সম্পদের প্রতি অন্তরের নির্ভরতা প্রত্যাখ্যানের অর্থে। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে সরলতা বজায় রাখতেন

এবং দানশীলতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন।

তার মানবিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল অন্যকে নিজের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া। ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেওয়া, দরিদ্রকে সহায়তা করা এবং মানুষের প্রয়োজন পূরণ করা তার নৈতিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এসবের মাধ্যমে তার তাসাওউফের সামাজিক চরিত্রটি আরও স্পষ্ট হয়। আত্মশুদ্ধি ও মানবসেবা তার কাছে পরস্পর বিচ্ছিন্ন বিষয় ছিল না।

তার ঐতিহাসিক প্রভাব

শাইখ জিলানী (র.)-এর প্রভাবকে তিনটি স্তরে বিবেচনা করা যায়।

প্রথমত, জ্ঞানগত প্রভাব। ফিকহ, হাদীস, তাফসীর ও নৈতিক শিক্ষার সমন্বিত পাঠদানের মাধ্যমে তিনি একটি বিস্তৃত শিক্ষাগত ঐতিহ্য তৈরি করেন।

দ্বিতীয়ত, আধ্যাত্মিক প্রভাব। তার শিক্ষার মাধ্যমে তাসাওউফকে শরীআতনিষ্ঠ আত্মশুদ্ধির কাঠামোর মধ্যে উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তী কাদিরিয়্যাহ ঐতিহ্যের ওপর এর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়ে।

তৃতীয়ত, সামাজিক প্রভাব। তার মজলিসে সাধারণ মানুষ থেকে আলিম পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণির লোকের অংশগ্রহণ তার দাওয়াতকে একটি বিস্তৃত সামাজিক পরিসর প্রদান করে।

পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে কাদিরিয়্যাহ বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত হয়। ইরাক, সিরিয়া, মিসর, আনাতোলিয়া, উত্তর আফ্রিকা, ভারতীয় উপমহাদেশ এবং আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে এর বিভিন্ন শাখা গড়ে ওঠে। স্থানীয় সংস্কৃতি ও সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে সমন্বয় করে এই ধারার বিভিন্ন রূপ তৈরি হয়।

ইন্তিকাল

শাইখ আবদুল কাদির জিলানী (র.)-এর ইন্তিকালের তারিখ নিয়েও সূত্রভেদে মতপার্থক্য রয়েছে। বহুল প্রচলিত মতে, তিনি ১১ রবীউস সানি ৫৬১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। অন্য কিছু প্রাচীন সূত্রে ৮ রবীউস সানী তারিখের উল্লেখ পাওয়া যায় তাকে বাগদাদে তার নিজস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-প্রাঙ্গণে দাফন করা হয়। শাইখের ইন্তিকালের পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে, তার কবর মুসলিম বিশ্বের কাছে এক মুবারক যিয়ারতকেন্দ্রে পরিণত হয়।

শাইখ আবদুল কাদির জিলানী (র.)-এর জীবনকে একমাত্রিক কোনো পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা কঠিন। তিনি ছিলেন ফিকহের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক, হাদীসের জ্ঞানচর্চাকারী, ওয়াইয, আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষক, সমাজসংস্কারক এবং একটি দীর্ঘস্থায়ী সূফী ঐতিহ্যের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব।

তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা সম্ভবত এই যে, ইসলামী জ্ঞানকে যদি চরিত্র ও আমলের সঙ্গে যুক্ত করা না যায় তবে তা মানুষের জীবনে পূর্ণাঙ্গ পরিবর্তন আনতে পারে না। একইভাবে আত্মিক সাধনাও যদি শরীআতের নৈতিক ও বিধিবদ্ধ কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তা তার উপস্থাপিত তাসাওউফের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে না।

বাগদাদের কঠিন শিক্ষাজীবন, দারিদ্র্যের অভিঘাত, দীর্ঘ আধ্যাত্মিক সাধনা এবং পরবর্তী জনসম্পৃক্ত দাওয়াত— এসবকিছু মিলিয়ে তার জীবনে একটি ধারাবাহিক রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। তিনি প্রথমে নিজেকে গড়ে তুলেছেন জ্ঞান ও সাধনার মাধ্যমে, পরে সেই অর্জনকে তালীম-তাদরীস, ওয়ায, আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণ এবং মানবকল্যাণে প্রায়োগিকভাবে নিয়োজিত করেছেন। তার উত্তরাধিকার কেবল কাদিরিয়্যাহ তরীকার বিস্তারে সীমাবদ্ধ নয়। তার জীবন ইসলামী জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার একটি সমন্বিত মডেল হিসেবে বহু শতাব্দী ধরে মুসলিম সমাজে আলোচিত হয়েছে। বিশেষত শরীআতনিষ্ঠ তাসাওউফ, নৈতিক চরিত্রগঠন, নফসের সংশোধন এবং মানুষের কল্যাণে জ্ঞানকে ব্যবহার করার যে দৃষ্টিভঙ্গি তার শিক্ষায় প্রতিফলিত হয়, সেটিই তার ঐতিহাসিক গুরুত্বের অন্যতম প্রধান ভিত্তি।

অতএব শাইখ আবদুল কাদির জিলানী (র.)-এর পুনর্পাঠ শুধু একজন বিখ্যাত সূফী সাধকের জীবনী পাঠ নয় বরং ইসলামী সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা ও সামাজিক নেতৃত্ব কীভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো– এরই এক তাৎপর্যময় খতিয়ানের আবিষ্কার।

সহায়ক সূত্র:

১. سير أعلام النبلاء، الذهبي
২. ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب الحنبلي
৩. مرآة الزمان في تواريخ الأعيان، سبط ابن الجوزي
৪. غبطة الناظر في ترجمة الشيخ عبد القادر، ابن حجر العسقلاني
৫. الشيخ عبد القادر الجيلاني، عبد الرزاق الكيلاني

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা
বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ (চার রং)
৪০,০০০/-
২য় ও ৩য় প্রচ্ছদ (চার রং)
৩০,০০০/-
ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা (সাদা কালো)
১৮,০০০/-
ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা (সাদা কালো)
১০,০০০/-
ভিতরের সিকি পৃষ্ঠা (সাদা কালো)
৬,০০০/-
ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা (চার রং)
২৫,০০০/-
ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা (চার রং)
১২,০০০/-
ভিতরের এক কলাম ৩" ইঞ্চি (সাদা কালো)
৩,০০০/-

বি. দ্র: একসাথে তিন মাসের জন্য ২৫%,
ছয় মাসের জন্য ৩৫% ও
এক বছরের জন্য ৫০% ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে।

যোগাযোগ
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মাসিক পরওয়ানা
মোবাইল: ০১৭৯৯৬২৯০৯০

ভিজিট করুন
তাসনীম তাসনীম
www.tasneembd.org

▼কুরআন ▼হাদীস ▼আকীদা
▼ইবাদত ▼প্রবন্ধ ▼জীবনী
▼জিজ্ঞাসা ▼বই

হেবা ও সম্পত্তি হস্তান্তর আইন সংশোধনী ২০২৬ পর্যালোচনা এবং বিকল্প

ইমাদ উদ্দিন তালুকদার



ক. হেবা পরিচিতি

'হেবা' (هبة) একটি আরবী শব্দ, যার সাধারণ অর্থ হলো দান করা, উপহার দেওয়া বা বিনা বিনিময়ে নিজের কোনো বস্তুর স্বত্ব অন্যকে হস্তান্তর করা। ইসলামী শরীআহ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি জীবিত থাকা অবস্থায় কোনো প্রকার প্রতিদান বা বিনিময় গ্রহণ ব্যতিরেকে স্বীয় সন্তুষ্টচিত্তে ও সুস্থ মস্তিষ্কে কোনো ব্যক্তির অনুকূলে সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তর করলে তাকে হেবা বলে।

হেবার ৩টি মৌলিক রুকন (শর্ত):

একটি হেবা শরীআতসম্মত ও বৈধ হতে ৩টি শর্ত পূরণ করতে হয়,

১. ইজাব (প্রস্তাব): দাতা কর্তৃক সম্পত্তি দানের স্পষ্ট ঘোষণা বা প্রস্তাব।

২. কবুল (গ্রহণ): গ্রহীতা (বা তার পক্ষে অভিভাবক) কর্তৃক সেই দান গ্রহণ।

৩. দখল হস্তান্তর: দাতা কর্তৃক গ্রহীতাকে সম্পত্তির বাস্তব দখল বুঝিয়ে দেওয়া।

খ. সম্পত্তি হস্তান্তর আইন সংশোধনী ২০২৬:

৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশে "Transfer of Property (Amendment) Act, 2026" (২০২৬ সালের ১০৫নং আইন) গেজেটে প্রকাশিত হয়, যা মূল Transfer of Property Act, 1882-এ নতুন দুটি ধারা ১২২এ ও ১২২বি সংযোজন করে। এই আইনের মূল বিধান অনুযায়ী-

- দাতা তার স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অন্যের নামে হস্তান্তর করেও নিজের জীবনকাল পর্যন্ত সেই সম্পত্তির ব্যবহার ও ভোগাধিকার (usufructuary right) নিজের কাছে সংরক্ষণ করতে পারবেন।
- এই ব্যবস্থা কেবল নির্দিষ্ট সম্পর্কের মধ্যে প্রযোজ্য। পিতা-মাতা ও সন্তান, দাদা-দাদি/নানা-নানি ও নাতি-নাতনি, এবং স্বামী-স্ত্রী। স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিবন্ধিত দলীল বাধ্যতামূলক।
- নিবন্ধনের পর এই দান সাধারণভাবে অপরিবর্তনযোগ্য (irrevocable), তবে পারস্পরিক সম্মতি বা জেলা জজের অনুমোদনে পরিবর্তনযোগ্য।
- দাতার জীবদ্দশায় গ্রহীতা মারা গেলে সম্পত্তি গ্রহীতার উত্তরাধিকারীদের কাছে বর্তায়, তবে দাতার ভোগাধিকার অক্ষুণ্ন থাকে।

আইনটির ঘোষিত উদ্দেশ্য

আইন প্রণেতাদের বক্তব্য অনুযায়ী এই আইনের মূল উদ্দেশ্য হলো বৃদ্ধ পিতা-মাতার সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। অনেক বাবা-মা সন্তানকে সম্পত্তি দিয়ে দেওয়ার পর সন্তানের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটলে নিজেরাই আবাসনহীন বা অসহায় হয়ে পড়েন। সংসদে বিল উত্থাপনকালে আইনমন্ত্রী স্পষ্ট করেছেন, এই আইন হেবা, ওসীয়ত বা অন্য কোনো প্রচলিত হস্তান্তর পদ্ধতিকে প্রভাবিত করবে না, বরং এটি একটি স্বজাতীয় (sui generis) বিকল্প ব্যবস্থা।

গ. নতুন সম্পত্তি হস্তান্তর আইন ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ

একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের জন্য ইসলামী বিধানই হচ্ছে শিরোধার্য। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদেরকে ইসলামের নির্দেশনা মেনে চলতে হয়। ইসলাম হচ্ছে একমাত্র পরিপূর্ণ জীবনবিধান, যেখানে মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট এবং সর্বোত্তম নির্দেশনা বিদ্যমান। যে নির্দেশনা বা শরীআ আইনে হাজার বছর স্বতন্ত্রভাবে সীমাবদ্ধহীন থেকে পরিপূর্ণতার সাথে বিশ্ব পরিচলানার বাস্তব উদাহরণ রয়েছে এবং এখনও সে আইন পরিপূর্ণ এবং ভবিষ্যতে স্বমহিমায় এর শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকবে। এ কারণে নতুন সম্পত্তি হস্তান্তর সংশোধনী আইন আমাদের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকায় মুসলিমদের জন্য এ আইনটি খেয়ালের বাইরে রাখা অবকাশ নেই। ফলে নতুন এ আইন শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের বিবেচনায় রাখতে হচ্ছে। এ আইনের উল্লিখিত উদ্দেশ্যকে আমরা সাধুবাদ জানাই, তবে ইসলামী শরীআয় এ আইনকে বৈধতা হচ্ছে কি না, মুসলমানদের

জন্য তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা প্রথমে দেখি এই আইনটি শরীআর কোনো বিধানের সাথে কতটুকু মিল বা অমিল রয়েছে।

নতুন সম্পত্তি হস্তান্তর সংশোধনী আইন ও ইসলামী শরীআর বিধান 'হেবা' ও 'ওসীয়ত'র সাথে সামঞ্জস্যতা:

- নতুন আইন ও ফিকহী হেবা (هبة)-এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য লক্ষণীয়,

সম্পর্কভিত্তিক কাঠামো
উভয় ক্ষেত্রেই নিকটাত্মীয়দের বিশেষত পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে সম্পত্তি হস্তান্তরের বিষয়টি এখানে মূল। ফিকহী হেবায়ও পিতা কর্তৃক সন্তানকে দান একটি সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ রূপ।

বিনা বিনিময়ে হস্তান্তর
উভয় ব্যবস্থাতেই কোনো আর্থিক প্রতিদান (ইওয়াদ, عوض) ছাড়াই সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়। উভয়ই মূলত দানভিত্তিক লেনদেন, বিক্রয় নয়।

প্রত্যাহারযোগ্যতার সীমাবদ্ধতা
নতুন আইনে নিবন্ধনের পর হস্তান্তর "সাধারণভাবে অপরিবর্তনযোগ্য"- এই নীতি শরীআর সেই মূলনীতির সাথে আংশিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, কবযা (قبض) পরবর্তী হেবা বিশেষত মাহরাম আত্মীয়দের (ذوو الأرحام المحارم) মধ্যে সাধারণত রুজূ (رجوع, প্রত্যাহার) যোগ্য নয়।

নাবালক সন্তানের ক্ষেত্রে কাঠামোগত সাদৃশ্য
শরীআহ নীতি অনুযায়ী পিতা কর্তৃক নাবালক (সগীর, صغير) সন্তানকে হেবায় পিতাই কবযা-গ্রহীতা (কাবিদ, قابض) হিসেবে গণ্য হন- এই ধারণার সাথে নতুন আইনের কাঠামোরও একটি পরোক্ষ মিল রয়েছে, কারণ উভয় ক্ষেত্রেই দাতা সম্পত্তির ওপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখেন।

সংশোধিত আইন ও হেবার অসামঞ্জস্যতা
নিম্নে এ দুয়ের মাঝে কতিপয় পার্থক্য দুলে ধরা হলো।

মালিকানা ও কবযার বিচ্ছিন্নতা
ইসলামী আইনশাস্ত্রের অন্যতম গ্রন্থ আল হিদায়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, কবযা বা দখল বুঝিয়ে দেওয়া ব্যতীত হেবা কার্যকর হয় না। কবযার পূর্বে দাতা হেবা ফেরত নিতে পারেন। এটি প্রমাণ করে কবযাই হেবাকে লাযিম (لازم, বাধ্যতামূলক) করে তোলে, নিছক ইজাব-কবূল (প্রস্তাব-গ্রহণ) নয়। নতুন আইনে ঠিক এই জায়গাতেই মৌলিক সংঘাত। আইনি মালিকানা তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহীতার কাছে হস্তান্তরিত হয়, অথচ দাতা তাখলিয়া তথা আজীবন সম্পত্তি স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। ফাতওয়ায়ে শামীতে ইমাম ইবন আবিদীন (র.) কবযা হুকমী তথা আইনত মালিকানায়ও এই তাখলিয়াকে অপরিহার্য শর্ত বলেছেন। দাতা ব্যবহার-নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখলে কবযা হুকমীও প্রতিষ্ঠিত হয় না। সে হিসেবে নতুন আইনে আমৃত্যু মালিকানা ধরে রাখায় এটি হেবার বিধানে পড়বে না।

উদ্দেশ্যগত অমিল: তামলীক বনাম সুরক্ষা
ইমাম কাসানীর 'বাদায়িউস সানাঈ'তে হেবার সংজ্ঞা 'তামলীকুল আইন বিলা ইওয়াদ (تمليك العين بلا عوض) অর্থাৎ হেবা হলো বস্তুর পূর্ণ মালিকানা বিনিময় ছাড়া হস্তান্তর করা। যার নৈতিক ভিত্তি পারস্পরিক ভালোবাসা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি। নতুন আইনের প্রাথমিক লক্ষ্য ভিন্ন, যেখানে দাতার নিরাপত্তাই উদ্দেশ্য। ফলে একই দলীলে দুটি ভিন্ন প্রকৃতির উদ্দেশ্য (পূর্ণ তামলীক ও আজীবন সুরক্ষা) মিশ্রিত হয়ে পড়েছে, যা শরীআতের হেবা-সংজ্ঞার সাথে কাঠামোগতভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

উত্তরাধিকার বিধানের সংঘাত: ফারাইযের সাথে সাংঘর্ষিকতা
নতুন আইনে গ্রহীতা পূর্বে মারা গেলে সম্পত্তি গ্রহীতার উত্তরাধিকারীদের কাছে বর্তায়। কিন্তু শরীআতের নীতি অনুযায়ী কবযার পূর্বে দাতার (বা এখানে প্রায়-কবযাহীন অবস্থায়) মৃত্যু বা সম্পত্তির চূড়ান্ত অবস্থান নির্ধারণে অসম্পূর্ণ হেবা মূল মালিকের ফারাইযের (فرائض, ইসলামী উত্তরাধিকার বণ্টন) আওতায় ফিরে আসার কথা। যেহেতু মূল হেবাই কবযার ঘাটতিতে সম্পূর্ণতা পায়নি বলে প্রশ্নবিদ্ধ, তাই এর ভিত্তিতে গ্রহীতার উত্তরাধিকারীদের কাছে সম্পত্তি বর্তানো ফারায়েযী হিসাবের সাথে সাংঘর্ষিক, বিশেষত যখন দাতার অন্য ওয়ারিশদের হক এই হিসেবে প্রভাবিত হয়।

এই মৌলিক পার্থক্যের কারণে সংশোধিত এই আইনকে শরীআর হেবা বিধানের অনুকূলে বলা যায় না।

ওসীয়তের বিধানে অগ্রহণযোগ্যতা
নতুন সংশোধনী আইনের মাধ্যমে হস্তান্তরিত সম্পত্তিকে ইসলামী শরীআতের 'ওসীয়ত' (وصية) হিসেবেও গণ্য করার বা ওসীয়তের আইনি সুবিধা দেওয়ারও সুযোগ নেই। নিচে শরঈ দলীলের আলোকে কারণগুলো তুলে ধরা হলো,

ওয়ারিশের অনুকূলে ওসীয়ত বাতিল
নতুন আইনে সম্পত্তি হস্তান্তরের সুযোগ রাখা হয়েছে কেবল নিকটাত্মীয়দের। যারা শরীআত অনুযায়ী দাতার সরাসরি ফারায়েযভুক্ত বা প্রাথমিক ওয়ারিশ। অথচ রাসূল ﷺ সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন,

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

-নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা প্রতিটি হকদারের পাওনা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং কোনো ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারীর অনুকূলে কোনো ওসীয়ত করা জায়িয নেই। (জামে তিরমিযী, হাদীস-২১২১)

যেহেতু ওয়ারিশদের জন্য ওসীয়ত করা শরীআতে মূলগতভাবেই নিষিদ্ধ, তাই এই আইনকে ওসীয়তের কাঠামোর ওপর দাঁড় করানো যাবে না।

ওসীয়তের জন্য ওয়ারিশদের সর্বসম্মত সম্মতির শর্ত
শরীআয় সর্বসম্মত ইসলামী নীতি অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার অপরাপর সকল ওয়ারিশ যদি পরম সন্তুষ্টচিত্তে ও স্বেচ্ছায় সম্মতি জ্ঞাপন করে, তবেই কেবল কোনো ওয়ারিশের পক্ষে করা ওসীয়ত কার্যকর হতে পারে। হাদীসে আছে, রাসূল ﷺ বলেন,

لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ

-কোনো ওয়ারিশের জন্য ওসীয়ত গ্রহণযোগ্য নয়; তবে অপরাপর সকল ওয়ারিশ যদি তা (স্বচ্ছন্দে) মঞ্জুর করে বা সম্মত হয়, তবে ভিন্ন কথা। (তাবারানী, হাদীস-২৪১০)

কিন্তু নতুন আইনের অধীনে দলীলটি দাতার জীবিত অবস্থাতেই চূড়ান্ত ও রেজিস্ট্রিকৃত হয়ে যায়, যেখানে দাতার মৃত্যুর পর অন্যান্য ওয়ারিশদের মতামতের তোয়াক্কা না করেই তা গ্রহীতার স্বত্বে সাব্যস্ত হয়, যা ওসীয়তের মূল শরঈ নীতিমালার সম্পূর্ণ বিরোধী।

হস্তান্তরের সময়কাল ও প্রকৃতির মৌলিক বৈপরিত্য
ওসীয়ত হলো শর্তাধীন একটি প্রক্রিয়া, যা ওসীয়তকারীর মৃত্যুর পরেই কেবল কার্যকর হয় এবং মৃত্যুর পূর্বে ওসীয়তকারী যেকোনো সময় তা বাতিল (রুজূ) করতে পারেন। পক্ষান্তরে, নতুন আইনে জীবিত থাকতেই রেজিস্ট্রি দলীলের মাধ্যমে সম্পত্তির 'আইনি মালিকানা' তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহীতার কাছে চলে যায় এবং তা অনির্দেশ্যভাবে অপরিবর্তনযোগ্য হয়ে পড়ে। ফলে জীবিত অবস্থার এই তাৎক্ষণিক আইনি হস্তান্তরের প্রকৃতি ওসীয়তের সংজ্ঞার সাথে কোনোভাবেই মেলে না।

তাই আমরা নতুন সংশোধিত আইনকে স্বতন্ত্র

আইন হিসেবে উল্লেখ করা এই আইনকে শরীআর ওসীয়তের মানদণ্ডেও উত্তীর্ণ বলতে পারি না। অর্থাৎ সংশোধিত আইনটি শরীআতের বিধানের সাথে মিলাতে গেলে হেবা বা ওসীয়তের সাথে প্রসঙ্গ আসে, অথচ এ দুয়ের কোনোটর নীতির সাথেই আইনটি মানানসই নয়।

ঘ. পিতামাতার নিরাপত্তায় শরঈ বিকল্প

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। আল্লাহ এ জীবনবিধান প্রদান করেছেন মানবজীবনের প্রতিটি দিক উত্তমরূপে পরিচালনার জন্য। এ জীবন বিধান সকল মানুষের সর্বাঙ্গীর কল্যাণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। সে হিসেবে মা-বাবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইসলামের নির্দেশনার অনুসরণ করাই সর্বোত্তম পন্থা। নিম্নে মা বাবার নিরাপত্তা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রণিত সম্পত্তি হস্তান্তরের সংশোধনী আইনে শরীআর সাথে সাংঘর্ষিক অবস্থানে না গিয়ে শরীআহ সমর্থিত বিকল্প দুটি পন্থা তুলে ধরা হলো-

মা বাবার জন্য ভরণপোষণ আইন:

সম্পত্তি হস্তান্তর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বিদ্যমান আইন, যা সন্তানের ওপর পিতামাতার ভরণপোষণ ও বাসস্থানের আইনি দায়বদ্ধতা আরোপ করবে, সম্পত্তি হেবা করা হোক বা না হোক- আইনটিকে আরো যথাযথ কার্যকর করা। প্রয়োজনে সর্বমহলের ধর্মীয় আলিম-উলামা ও পীর মাশাইখদের মাধ্যমে পিতামাতার প্রতি সন্তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মনিটরিং সেল ও কাউন্সিল গঠন করা। এটি কুরআন-হাদীসে সুপ্রতিষ্ঠিত নীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে। এটি শরীআহ সমর্থন করবে এবং মা-বাবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে।

উপকার গ্রহণের অনুমতিকে আইনি রূপ দেওয়া

পিতামাতার বা যে কেউ চাইলে তার সম্পদ থেকে অন্য কাউকে উপকার গ্রহণের অনুমতি প্রদান করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে মালিকানা ব্যক্তির কাছেই থাকব, আর উপকার গ্রহীতার কেবল উপকার (মানফায়া) গ্রহণের অনুমতি থাকবে। এখানে আরও সুবিধা হচ্ছে, ব্যক্তি চাইলে যে কোনো সময় এ অনুমতি ফিরিয়ে নিতে পারেন। মা বাবার নিরাপত্তার দিক খেয়াল করলে শরীআহসম্মত উপকার গ্রহণকে আইনি রূপ দিতে দেওয়া যায়, তখন মালিকানা তাদের কাছেই থাকবে আবার তাদের সাথে অন্যায় করলে বা চাইলে যেকোনো সময় উপকার গ্রহণের এই সুযোগকে প্রত্যাহার করতে পারবেন।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান, যেখানে মানবজীবনের যাবতীয় প্রয়োজন ও সমস্যার সুষম সমাধান বিদ্যমান। সেই হিসেবে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বৃদ্ধ বাবা-মায়ের নিরাপত্তা ও আবাসন সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে গৃহীত এ মানবিক উদ্যোগ ও লক্ষ্যকে আমরা অবশ্যই সাধুবাদ জানাই। তবে উদ্দেশ্য মহৎ হলেও এর জন্য নির্ধারিত আইনি প্রক্রিয়াটি শরীআতের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক। দেশের ৯০ ভাগেরও বেশি জনগণ মুসলিম এবং তারা তাদের দৈনন্দিন ও সম্পত্তি সংক্রান্ত লেনদেনে শরীআহর বিধান পালনে অত্যন্ত অনুরাগী। তাই এই আইনটিকে শরীআহর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ করতে সর্ব মহলের গ্রহণযোগ্য আলিম ও শরীআহ বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। উলামায়ে কিরামের কাছ থেকে শরীআ দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করা এদেশের জনগণের জীবনদর্শনের জন্য খুব প্রাসঙ্গিক। কারণ মানুষ ইসলামের নির্দেশনামতই নিজেদের জীবনকে সাজাতে চায়। তাই নতুন সম্পত্তি হস্তান্তর আইন সংশোধনী শরীআর আলোকে সাজানো এবং মা বাবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রস্তাবিত দিক বিবেচনার প্রয়োজন। পাশাপাশি ভবিষ্যতে প্রত্যেকটি আইনকে আরও বেশি কার্যকর ও জনগণের ধর্মীয় অনুভূতি অক্ষুণ্ন রাখতে উলামায়ে কিরামের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

উৎস:

*ফাতওয়ায়ে শামী * ফাতওয়ায়ে আলমগীরী *আল-হিদায়া *বাদাইয়ুস সানাঈ

Al Arab Tailors
মো. আনোয়ার হোসেন
প্রোপ্রাইটর
আল আরব টেইলার্স
পাঞ্জাবী স্পেশালিস্ট
১১৮, করিম উল্লাহ মার্কেট (নিচ তলা)
বন্দর বাজার, সিলেট
01734-346601



আল কুদস পুনরুদ্ধার এক ঐতিহাসিক অভিযাত্রা

কাজী আবরার দস্তগীর

ক্রুসেডারদের এই অভিযানে দুঃখজনকভাবে সহযোগী ভূমিকা পালন করে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের উলামা, শাসক এবং সাধারণ জনগোষ্ঠীর গাফিলতি! সে সময় সমগ্র মুসলিম বিশ্ব যেন এক অদ্ভুত গাফিলতিতে ডুবেছিল। ঐ সময়কার চিত্র লিখে সময় নষ্ট করতে চাই না, পাঠকমহল আজকের মুসলিম বিশ্বের দিকে তাকালেই তা সহজে উপলব্ধি করতে পারবেন।

আল-কুদস শহরের ইতিহাস প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরনো। প্রাসঙ্গিকতার স্বার্থে আমরা আরম্ভ করছি ৬২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে। পবিত্র নগরী আল-কুদসকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক মুজিযা আল ইসরা এবং মিরাজ, এসম্পর্কে কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে-

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দ মুতাবিক ১৬ হিজরী সনে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল-কুদস শহরে প্রবেশ করেন। তৎকালীন অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মযাজক পেট্রিয়ার্ক সফ্রোনিয়াস উমর (রা.)-এর কাছে জেরুসালেম শহরের চাবি হস্তান্তর করেন। এরপর উমর (রা.) ঈসায়ীদের সাথে একটি চুক্তি করেন, যা العهدة العمرية বা উমারী চুক্তি হিসেবে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সময়কালে আল কুদস নগরী মুসলমানদের শাসনাধীন চলে আসার পর থেকে উমাইয়া এবং আব্বাসী খিলাফত আমলেও তা যথাযথভাবে মুসলিম শাসকদের অধীনে সংরক্ষিত থাকে।

১০৯৫ (৪৮৮ হিজরী) সালে পোপ দ্বিতীয় আরবান ফ্রান্সে ক্রুসেড যুদ্ধের আহ্বান করে, পিটার নামক এক ক্যাথলিক ধর্মযাজক ইউরোপজুড়ে পোপ দ্বিতীয় আরবানের আহ্বান ছড়িয়ে দিলে সাধারণ খ্রিস্টান মানুষদের মধ্যে এক অসাধারণ বিপ্লব তৈরি করতে সক্ষম হয়, যার প্রভাব পরবর্তী সময়ে ইউরোপীয় ক্যাথলিক শাসক এবং অভিজাত শ্রেণির মধ্যেও পড়ে। এমনকি ১০৯৯ সালের মধ্যেই ক্রুসেডাররা আল-কুদস শহর দখল করে। পরবর্তী সময়ে সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ূবী (র.) ১১৮৭ সালে ক্রুসেডারদের থেকে বাইতুল মাকদিস পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। সালাহউদ্দীন আইয়ূবী (র.)-এর ওফাতের কিছুকাল পরে সিসিলির রাজা ফ্রেডরিকের সময়কালে ক্রুসেডাররা জেরুসালেমকে পুনরায় দখল করে এবং দখলের ১১ বছর পর সুলতান নাজমউদ্দীন সালিহ আইয়ূব ১২৪৪ খ্রিস্টাব্দ মুতাবিক ৬৪২ হিজরী সালে তা পুনরুদ্ধার করেন।

এরপর থেকে আল-কুদস শহর বিভিন্ন সময়কালে ধারাবাহিকভাবে আইয়ূবী, মামলুক এবং উসমানী মুসলিম শাসকগণের অধীনে সংরক্ষিত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে ইংরেজরা ১৯১৭ সালে আল-কুদস শহর দখল করে, যা ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এরপর ১৯৪৮ সালের মে মাসে দখলদার ইসরাঈল রাষ্ট্রের ঘোষণা করা হয়। *(দীর্ঘসূত্রতার জন্য এসময়ের পরবর্তীকালীন ইতিহাস পরিত্যাগ করা হলো)*

এই প্রবন্ধ লেখার সময় আমি আল-কুদসকে সকল কিছুর মধ্যখানে রেখে চিন্তা-ভাবনা করেছি। (এজন্য কোনো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবনের ততটুকুই আনা হয়েছে যতটুকু আল-কুদসের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত) তাই আমরা এখন দেখব কীভাবে ক্রুসেডাররা উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আমানত মুসলিম উম্মার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল।

আগেই বলেছি ক্রুসেড যুদ্ধ শুরু করে পোপ দ্বিতীয় আরবান এবং পবিত্র ভূমি জেরুসালেম দখলের এই আহ্বানে সবার প্রথম যারা সাড়া দেয় তারা হলো ইউরোপের সাধারণ ক্যাথলিক জনগোষ্ঠী, পরবর্তীতে তাদের সাথে ইউরোপের ক্যাথলিক শাসক এবং অভিজাত শ্রেণি যুক্ত হয়। ক্রুসেডারদের এই অভিযানে দুঃখজনকভাবে সহযোগী ভূমিকা পালন করে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের উলামা, শাসক এবং সাধারণ জনগোষ্ঠীর গাফিলতি! সে সময় সমগ্র মুসলিম বিশ্ব যেন এক অদ্ভুত গাফিলতিতে ডুবেছিল। ঐ সময়কার চিত্র লিখে সময় নষ্ট করতে চাই না, পাঠকমহল আজকের মুসলিম বিশ্বের দিকে তাকালেই তা সহজে উপলব্ধি করতে পারবেন।

৪৯২ হিজরী মুতাবিক ১০৯৯ সালে ক্রুসেডররা যখন বাইতুল মাকদিস দখল করলো তখন হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বয়স ৪২ বছর। তিনি সামসময়িক মুসলিম বিশ্বের অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরে দীর্ঘমেয়াদী দুইটি কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেন। প্রথম পদ্ধতি হলো: নিজের নফসকে ইসলাহ করা, কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

-নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। (সূরা রাআদ, আয়াত: ১১)

দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো: নিজেকে ইসলাহ করার পর অন্যকে ইসলাহ করার জন্য তরবিয়ত দেওয়া, এসম্পর্কে কুরআনে পাকে বর্ণিত হয়েছে-

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

-তোমরা এমন ফিতনা (বিপর্যয়) থেকে বেঁচে থাকো, যা তোমাদের মধ্যে যারা যুলম করেছে, শুধু তাদের ওপরই আপতিত হবে না; আর জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর। (সূরা আনফাল, আয়াত: ২৫)

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ

-আর আপনার প্রতিপালক এমন নন যে, তিনি জনপদসমূহকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করবেন, যখন তার অধিবাসীরা সংশোধনকারী (সৎকর্মশীল)। (সূরা হূদ, আয়াত: ১১৭)

এই উভয় প্রকার ইসলাহ করার জন্য ইমাম গাযালী রাহমতুল্লাহি আলাইহি ইলমী বিপ্লবকে সামনে রেখেছেন। তিনি উন্মার জন্য লিখেছেন "ইয়াহইয়াউ উলূমিদ্দীন"।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (র.) ৫০৫ হিজরীতে ওফাতের পূর্বে মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তরবিয়ত করে তার জীবনের বড় একটা অংশ অতিবাহিত করেছেন বাগদাদের নিযামুল মুলক-এর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায়ে নিযামিয়ায়। শাইখ আব্দুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 488 হিজরীতে যখন বাগদাদে আগমন করেন, সে সময় শাইখ আব্দুল কাদির জিলানী ছিলেন যুবক। তার বয়স ছিল ১৮ বছর। শাইখ জিলানী (র.) বাগদাদ আগমনের পর থেকে ইমাম গাযালীর ওফাতের আগ পর্যন্ত তিনি তার সুহবতকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নেন। শাইখ আব্দুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম গাযালীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইসলাহী কাজ করতে থাকেন। এমনকি সুলতান নূর উদ্দীন জঙ্গী (র.) এবং তার অধিকাংশ আমির, মুশির এবং সামরিক ব্যক্তিত্ব এই দুই ইমামের তরবিয়তে প্রভাবিত ছিলেন। আব্দুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মানুষকে তরবিয়ত দেওয়ার পাশাপাশি ৫৪৪ থেকে ৫৪৫ হিজরী সনের মধ্যে উম্মাগর জন্য লিখেন-"আল ফাতাহ আর রব্বানী"।

সুলতান নূর উদ্দীন জঙ্গী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হলেন সুলতান ইমাদ উদ্দীন-এর সুযোগ্য সন্তান। ক্রুসেডারদের থেকে বাইতুল মাকদিস উদ্ধার করার চেষ্টা আরম্ভ হয় ইমাদ উদ্দীন জঙ্গীর পূর্বে ইরাকের মসুল নগরী থেকে । এই সামরিক অভিযান আরম্ভ করেন মাওদুদ। অতঃপর মসুলের সুলতান আল বুরসুকী, তিনি ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক। সুলতান আল বুরসুকীই প্রথম মসুল এবং আলেপ্পোর বিস্তৃত এলাকাকে একত্রিত করেন। সুলতান আল-বুরসুকী এবং মাউদুদ উভয় অভিযানে বের হয়েছিলেন আলেপ্পোর কাযী আল-খাশশাবের আহ্বানে। মাওদুদ, সুলতান আল-বুরসুকী এবং কাযী আল-খাশশাব এবং পরবর্তীতে সুলতান ইমাদউদ্দীন তারা সকলেই ধারাবাহিকভাবে হাশাশিনদের হাতে গুপ্ত হত্যার শিকার হয়ে শাহাদাতবরণ করেন। সুলতান আল-বুরসুকীর শাহাদাতের পর মসুলের কাযীর পরামর্শে আল-বুরসুকীর ছেলের পরিবর্তে ইমাদউদ্দীন জঙ্গী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে মসুল এবং আলেপ্পোর বিস্তৃত এলাকার সুলতান হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ইমাদউদ্দীন শক্ত হাতে নিজের এলাকায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি ক্রুসেডারদের দখলকৃত নগরী এডেসা বিজয় করেন। ইমাদউদ্দীন জঙ্গী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শাহাদাতের পর তার ছেলে নূরউদ্দীন জঙ্গী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সালতানাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইবন আসির তার ইতিহাসের বইয়ে নূরউদ্দীন জঙ্গী সম্পর্কে লিখেছেন, খুলাফায়ে রাশিদীন এবং উমর ইবন আব্দুল আযীয (র.)-এর পর সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন নূরউদ্দীন মাহমুদ জঙ্গী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন ফকীহ এবং একজন মুহাদ্দিস। "কিতাবুল জিহাদ" নামে একটি হাদীসের বইও তিনি লিখেছিলেন। সুলতান ইমাদউদ্দীনের শাহাদাতের পর ক্রুসেডাররা আর্মেনীয় খ্রিস্টানদের সহযোগিতায় এডেসা পুনরায় দখল করে, নূরউদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সুলতান হওয়ার সাথে সাথেই এডেসা বা আল-রুহা নগরী ক্রুসেডারদের থেকে পুনরুদ্ধার করেন। তিনি তার সালতানাতে অনেক দরসগাহ এবং কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন । সুলতান নূরউদ্দীন নিজের জন্য রাষ্ট্রের সর্বনিম্ন ভাতা নির্ধারণ করেন । বর্ণিত আছে, তার কাছে একবার বর্ণনা করা হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে তলোয়ার ব্যবহার করতেন। দেখা গেলো পরের দিন সুলতান নির্দেশনা জারি করেন যেন সকল আমির-উমরা এবং রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিবর্গ যেন হাদীসের বর্ণনানুযায়ী তলোয়ার ব্যবহার করেন।

সুলতান ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু। তিনি তার সালতানাতে সব রকমের যুলমের মূলোৎপাটন করে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন। এমনকি তার কাছে একবার সালতানাতের ট্যাক্স বা কর সম্পর্কে অভিযোগ করা হলো যে এটা যুলম, এটা আল্লাহর শরীআহ বহির্ভূত। তিনি এই অভিযোগের ভিত্তিতে জঙ্গী সালতানাতের সকল রাষ্ট্রীয় কর মওকুফ করে দিলেন। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন দারুল আদল; যেখানে প্রতি সোমবারে তিনি নিজে বসতেন এবং সাধারণ মানুষ তার সাথে দেখা করে তার গভর্নরদের সম্পর্কে অভিযোগ দিতে পারতো। তিনি ছিলেন একজন দ্বীনদার ব্যক্তিত্ব। প্রতি সোম এবং বৃহস্পতিবারে রোযা রাখতেন।

নূর উদ্দীন জঙ্গী এক পর্যায়ে দিমাশকের উলামা এবং জনসাধারণের সমর্থন লাভ করেন যার ফলে তিনি বিনা রক্তপাতে দিমাশককে নিজের সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং তিনিই প্রথম সমগ্র শাম অঞ্চলকে এক করতে সক্ষম হন। সুলতানের শাসনামলে মিশর ছিল ফাতিমী খিলাফতের অধীনে এবং সে সময়কার মিশরের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত অস্থিতিশীল। অবস্থা উপলব্ধি করে সে সময় সুলতান তার নির্ভরযোগ্য সামরিক ব্যক্তিত্ব শেরকুহ-কে মিশর অভিযানে প্রেরণ করেন । শেরকুহ-এর নেতৃত্বে মোট তিনবার মিশরে অভিযান পরিচালিত হয় এবং এই তিন অভিযানেই শেরকুহর সঙ্গী ছিলেন ফকীহ ঈসা আল-হিকারী এবং তার নিজ ভাতিজা ইউসুফ। তৃতীয় অভিযানে শেরকুহ কাইরো বিজয় করতে সক্ষম হন এবং মিশরের উযীর হিসেবে দুই মাস দায়িত্ব পালন করার পর ইন্তিকাল করেন। শেরকুহর ওফাতের পর তার ভাতিজা ইউসুফকে মিশরের উযীর হিসেবে নির্বাচন করা হয়। এই ইউসুফই হলেন ইতিহাস বিখ্যাত সালাহউদ্দীন আইয়ূবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। উযীর হওয়ার পর তাকে ফকীহ ঈসা আল-হিকারী সার্বিকভাবে সহযোগিতা এবং সমর্থন করেন।

সালাহউদ্দীন আইয়ূবী (র.) একজন ন্যায়পরায়ণ এবং দয়ালু শাসক হিসেবে মিশরে নূর উদ্দীন জঙ্গী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রতিনিধিত্ব করতে থাকেন। তিনি মিশরে বিভিন্ন দরসগাহ এবং কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন যা ছিল নূর উদ্দীন জঙ্গী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শাসন ব্যবস্থার অনুরূপ। ৫৬৭ হিজরী সালের এক জুমুআবারে সালাহউদ্দীন আইয়ূবী সুলতান নূর উদ্দীন-এর নির্দেশনায় ফাতিমী খিলাফতের বিলুপ্তি ঘোষনা করে আব্বাসী খিলাফতের নামে খুতবা পাঠের নির্দেশনা দেন । এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর তিনি সকল প্রকারের রাষ্ট্রীয় কর মওকুফ করেন এবং মিশরকে সার্বিকভাবে পুনর্গঠন করেন। তিনি দারুদ-দিয়াফা নামক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে হজ যাত্রীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে মেহমানদারী করা হতো। সালাহউদ্দীন আইয়ূবীর মিশর শাসনামলে তিনি বিভিন্ন মানুষের দ্বারা সহযোগিতা লাভ করেন, তাদের মধ্য থেকে কতকের নাম উল্লেখ করা হলো- শাইখ আব্দুল কাদির জিলানী (র.)-এর ছাত্র ইবন নাজাহ, মিশরের বিখ্যাত কাযী আল-ফাদিল,ফকীহ ঈসা আল-হিকারী, তার ভাই মালিক আল-আদিল, তার ভাতিজা তকীউদ্দীন, তার নৌবাহিনীর কমান্ডার হুসামউদ্দীন লু'লু এবং তার প্রকৌশলী বাহাউদ্দীন কারাকুশ যিনি ইস্কান্দারিয়াসহ বিভিন্ন শহরকে বিভিন্ন দুর্গ এবং স্থাপনার মাধ্যমে ক্রুসেডারদের জন্য দুর্ভেদ্য নগরীতে পরিণত করেন।

মিশর বিজয়ের পর সুলতান নূরউদ্দীন আল-কুদস বিজয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং আল-আকসা মসজিদে স্থাপনের জন্য একটি মিম্বর তৈরি করেন। কিন্তু ৫৬৯ হিজরী সালে এই ন্যায়পরায়ন সুলতান নূর উদ্দীন জঙ্গী ইন্তিকাল করেন। তার ওফাতের কিছু সময় পর সালাহউদ্দীন আইয়ূবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দিমাশকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সুলতান সালাহউদ্দীন দিমাশকের দায়িত্ব গ্রহণের কিছুকাল পর আর্নল্ড ইতিহাসে প্রথমবারের মতো লোহিত সাগর ব্যবহার করে মদীনা শরীফ আক্রমণ করার চেষ্টা করলে সালাহউদ্দীন তার নৌ বাহিনীর কমান্ডার হুসামউদ্দীন লু'লু কে আর্নল্ডের পিছনে প্রেরণ করেন। হুসামউদ্দীন লু'লু এবং আর্নল্ডের মধ্যে মদীনা শরীফ থেকে প্রায় একশত মাইল দূরে রাবেগ নামক স্থানে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যেখানে হুসামউদ্দীন লু'লু বিজয় লাভ করে এবং আর্নল্ড এবং তার কিছু সঙ্গী-সাথি ব্যতীত তার সম্পূর্ণ বাহিনী ধ্বংস হয়ে যায়। আর্নল্ড তার দুর্গ কার্কে ফিরে পুনরায় আরেক ন্যাক্কারজনক কাজ করে, সে হজের কাফেলার উপর আক্রমণ করে তাদের বন্দি করে। সে সময় মুসলমান এবং ক্রুসেডারদের মধ্যে চুক্তি ছিল যে হজের কাফেলার উপর ক্রুসেডাররা কেনো প্রকার আক্রমণ করবে না।

সুলতান সালাহউদ্দীনের কাছে এ খবর পৌঁছলে তিনি মুসলিম এবং ক্রুসেডারদের মধ্যে যত চুক্তি ছিল সবকিছুর বিলুপ্তি ঘোষনা করেন। এবং শপথ করেন আর্নল্ড যদি তার হস্তগত হয় তাহলে তিনি নিজ হাতে তাকে হত্যা করবেন। সুলতান ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে কার্খ, সাফুরিয়া, তাবারিয়া দুর্গ সমূহে অভিযান প্রেরণ করেন *(এই অভিযানগুলোতে সুলতানের সামরিক দক্ষতা লক্ষ্য করা যায়, দীর্ঘসূত্রতা এড়াতে সুলতানের সামরিক বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব না)।*

৫৮৩ হিজরী সালে মুসলিম বাহিনী এবং ক্রুসেডারদের মধ্যে তাবারিয়ার পাশে হিত্তিন নামক গ্রামে ঐতিহাসিক হিত্তিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে সুলতানের ভাতিজা তকীউদ্দীনের নেতৃত্বে ক্রুসেডারদের ট্রু ক্রস মুসলমানদের হস্তগত হয় জেরুসালেমের রাজা রেমন্ড এবং আর্নল্ডসহ ক্রুসেডারদের সকল বড় বড় নেতা মুসলমানদের কাছে বন্দি হয়। সুলতান আর্নল্ডকে নিজ হাতে হত্যা করে তার ওয়াদা পূরণ করেন। হিত্তিন যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সুলতান ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী ক্রুসেডারদের দখলকৃত সকল শহরে এক যুগে অভিযান প্রেরণ করে আসকালান, ইয়াফা, হাইফা এবং আক্কাসহ ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী প্রায় সকল দখলকৃত শহর এবং দুর্গ তিনি পুনরুদ্ধার করেন।

অবশেষে ৫৮৩ হিজরী সালেই সুলতানের মুসলিম বাহিনী দুই সপ্তাহের জন্য বাইতুল মাকদিস অবরুদ্ধ করেন। মুসলিম বাহিনী নগর প্রাচীরের একাংশ ভূপাতিত করতে সক্ষম হলে ক্রুসেডাররা এক চুক্তির মাধ্যমে আল কুদস নগরী সুলতান সালাউদ্দীনের কাছে হস্তান্তর করতে রাযী হয়। মুসলমানরা প্রায় ৮৮ বছর পর উমর (রা.)-এর আমানত পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। ১১৮৭ সালের ২ অক্টোবর মুতাবিক ৫৮৩ হিজরী সালের শবে মেরাজের তারিখ ২৭ রজব শুক্রবার রাতে সালাউদ্দীন আইয়ূবী (রা.) আল কুদস নগরীতে প্রবেশ করেন। আল কুদস বিজয়ের পর সুলতান নূরউদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির তৈরিকৃত মিম্বর আল আকসা মসজিদে স্থাপন করা হয় এবং বাইতুল মাকদিসের কাযী মহিউদ্দীন আল যাকী আল আকসা মসজিদে প্রথম খুতবা প্রদান করেন। সুলতান আল কুদস বিজয়ের পর আল আকসা মসজিদ এবং নগরী সংস্কার করেন। আল কুদস বিজয় কোনো একক ব্যক্তিগত কর্মফল ছিল না বরং নিযামুল মুলক, ইমাম গাযালী, শাইখ আব্দুল কাদির জিলানী, ইমাদউদ্দীন, নূরউদ্দীন এবং সালাহউদ্দীন রাহিমাহুমুল্লাহর প্রজন্মের সামগ্রিক প্রচেষ্টার ফল, যা আল্লাহ তাআলা তার একনিষ্ঠ বান্দাদের দান করেন।



বিবাহ সংক্রান্ত

একটি সুক্ষ্ম মাসআলা ও পর্যালোচনা

ইব্রাহিম আরিফ

আল্লাহ তাআলা আহকামুল হাকিমীন। তিনি বান্দার জন্য যত বিধান নাযিল করেছেন তাঁর প্রত্যেকটিকে বান্দাকে কল্যাণ দ্বারা বেষ্টিত করে রেখেছেন। আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহের মধ্যে অন্যতম অনুগ্রহ হচ্ছে 'বিবাহ'। তবে এই বিধানের জন্য তিনি একটি নির্দিষ্ট সীমা দান করেছেন, যা কারো জন্য অতিক্রমের সুযোগ নেই। তিনি হোন কোনো বুযুর্গ বা যেকোনো ইসলামি দলের আমির! সম্প্রতি একটি দলের বহিস্কৃত এমপির দ্বিতীয় বিয়ের ইতিহাস বেশ আলোচিত। অভিযোগ উঠেছে, উনার প্রথম স্ত্রী, দ্বিতীয় স্ত্রীর বাবার আপন খালা। অর্থাৎ দ্বিতীয় স্ত্রী তার নিজের বাবার খালার সতিন হয়ে এমপি সাহেবের সংসারে গিয়েছিল! যদি এই অভিযোগ সত্য হয়ে থাকে, তবে তা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়! কেননা ইসলাম এমন বিয়েকে বৈধতা দেয় না। অনেকেই এজাতীয় বিয়ের হুকুম জানতে আগ্রহী। তাই বক্ষমান প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করব, 'কোন দুই নারীকে একত্রে বিয়ে করা হারাম' এ বিষয়ে।

বিশেষ অবস্থার কারণে কিছু মহিলাকে বিবাহ করা সাময়িকভাবে হারাম হয়ে যায়। আবার সেই বিশেষ অবস্থা দূরীভূত হয়ে গেলে তাদের বিবাহ করা হালাল হয়ে যায়। তারমধ্যে অন্যতম হচ্ছে, ঘনিষ্ঠতম দুই মহিলাকে একসঙ্গে বিবাহ করা:

একজন পুরুষ একই সময়ে এমন দুই মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে রাখতে পারবে না, যাদের কোনও একজনকে পুরুষ ধরা হলে অন্যজনের সঙ্গে তার বিয়ে বৈধ হবে না। যেমন: ফুফু-ভাতিজি ও আপন দুই বোন।

কারণ, এদের মধ্যে ফুফুকে যদি চাচা মনে করা হয় তাহলে চাচার সঙ্গে ভাতিজির বিয়ে হারাম, আবার ভাতিজিকে যদি ভাতিজা মনে করা হয়, তাহলে ফুফুর সঙ্গে ভাতিজার বিয়ে বৈধ নয় অথবা দুই বোনের মধ্যে কোনও একজনকে ভাই মনে করা হলে ভাইয়ের জন্য বোনকে বিয়ে করাও হারাম।

ইমাম শামী (র.) বলেন,

أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى

অর্থাৎ দুই নারীকে এমনভাবে একত্রে বিয়ে করা যাবে না, তাদের একজনকে পুরুষ ধরে নিলে অপরজন তার জন্য বিবাহযোগ্য থাকে না। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ৩/৩৯)

অনুরূপ ফাতহুল ক্বাদীর গ্রন্থেও এসেছে,

وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا رَجُلًا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْأُخْرَى

অর্থাৎ এমন দুই নারীকে একই সঙ্গে স্ত্রী করা যাবে না, যাদের একজনকে পুরুষ ধরে নিলে সে অপরজনকে বিবাহ করতে পারত না। (ফাতহুল কাদীর, ৩/২১৭)

উপরিউক্ত মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত মহিলাগণ নিম্নরূপ—

ক. দুই বোন: একসঙ্গে দুই বোনকে বিবাহ করা যাবে না। এমনকি এক বোনকে তালাক দিয়ে ইদ্দত চলাকালীন সময়ে সহোদরা অন্য বোনকে বিবাহ করলে জায়িয হবে না। তবে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর অন্য বোনকে বিয়ে করতে পারবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

-দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা তোমাদের জন্য হারাম। (সূরা নিসা, আয়াত-২৩)

খ. একজন নারী ও তার ফুফু, অথবা একজন নারী ও তার খালা: কোনো নারী ও তার ফুফুকে একসঙ্গে বিবাহ করা হারাম। অনুরূপ একজন নারী ও তার খালাকেও একসঙ্গে বিবাহ করা হারাম।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعَمَّتِها، ولا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وخالَتِها

-এক নারী ও তার ফুফুকে এবং এক নারী ও তার খালাকে একত্র করা যাবে না। (সহীহ বুখারী, ৫১০৯, সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৪০৮)

গ. একজন নারী ও তার পিতার খালা: কোনো নারী এবং সেই নারীর খালাকে যেভাবে একত্রে বিয়ে করা হারাম, ঠিক তেমনিভাবে সেই নারীর পিতার খালাকেও একত্রে বিবাহ হারাম হবে। কেননা বুখারী শরিফে এসেছে, ইমাম যুহরী র. বলেন,

فنُرى خالةَ أبيها بتلك المنزلةِ.

-স্ত্রীর পিতার খালার ব্যাপারেও একই হুকুম। (সহীহ বুখারী, হাদীস-৫১১০)

অর্থাৎ, কোনো নারী এবং সেই নারীর পিতার খালাকে একত্রে বিয়ে করা নিষিদ্ধ। কেননা সেই নারীর পিতার খালা মূলত তার আপন দাদির বোন। এক্ষেত্রে আপন দাদির বোনও নসবের দিক থেকে দাদি। সুতরাং দাদি আর নাতনির মধ্যে একজনকে পুরুষ ধরলে তাদের বিয়ে নিষিদ্ধ হবে। কারণ দাদিকে নাতি বা নাতনিকে দাদা বিবাহ করতে পারেন না। সুতরাং এই দুই নারীকে একত্রে বিয়ে করা কোনোভাবেই বৈধ হয় না। যদি উপরোল্লিখিত অভিযোগ সত্য হয়ে থাকে তবে সেই এমপির বিবাহ অবৈধ বলেই গণ্য হবে। কেননা অভিযোগ অনুযায়ী, তিনিও দাদি এবং নাতনিকে একত্রে বিবাহ করেছেন!

তবে এসব ক্ষেত্রে দুই নারীর একজন মারা গেলে কিংবা একজনকে তালাক দিয়ে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর অপরজনকে বিবাহ করা জায়িয।

রাদ্দুল মুহতার-এ এসেছে—

مَاتَتْ امْرَأَتُهُ لَهُ التَّزَوُّجُ بِأُخْتِهَا بَعْدَ يَوْمٍ مِنْ مَوْتِهَا كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ عَنْ الْأَصْلِ

অর্থাৎ, স্ত্রী মারা গেলে পরদিনই তার বোনকে বিবাহ করা জায়িয। (রাদ্দুল মুহতার, ৩/৩৮)

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন এবং মনগড়া ইসলাম পালন থেকে হিফাযত করুন। আমীন।



কবি আবদুল মুকীত চৌধুরী-এর

সাক্ষাৎকার

বিশিষ্ট কবি, গবেষক, সাংবাদিক আবদুল মুকীত চৌধুরীর সাহিত্যে রয়েছে কাব্য, কাব্যানুবাদ, কাজী নজরুল ইসলামের ইসলামী ও কবিতা এবং জাতীয় কবি রূপে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাকে উপস্থাপনে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের করণীয় সম্পর্কে গ্রন্থাবলি সম্পাদনা, শিশু সাহিত্য, ভ্রমণ কাহিনী, অনুবাদ-কর্ম সম্পাদনা এবং বাংলাদেশ বেতারে দীর্ঘকালীন সংশ্লিষ্টতায় অবদান। আল্লাহ তাআলা, সায়্যিদুল মুরসালীন প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা.), ইসলামের কল্যাণ ও শান্তি-বার্তা বিষয়ে তাঁর কয়েকখানা গ্রন্থ। মহানবী (সা.) প্রসঙ্গে আন্তজার্তিক পর্যায়ের গ্রন্থের অনুবাদ সম্পাদনা ও হযরত আলী (রা.)-এর দীওয়ানের কাব্যানুবাদ ও অনুদিত বাংলা 'নাহযুল বালাগাহ পরিচিতি সম্পাদনা করেছেন তিনি। বাগধারা ও প্রবাদ প্রবচনের শব্দ-ভূষিত অনন্য কাব্যকলায় পথিকৃৎ কবি বাংলা অভিধান ঘেটে স্বর-অ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রাসঙ্গিক কাব্যের সূচনাও করেছেন। কথাশিল্পী চিন্তাবিদ অধ্যাপক শাহেদ আলী ও ভাষাসৈনিক চিন্তাবিদ অধ্যাপক আবদুল গফুরের সাথে ইসলামিক ফাউন্ডেশন গবেষণা ত্রৈমাসিকে সম্পাদনায় উজ্জ্বল ভূমিকা রাখেন তিনি। রাসূল (সা) সম্পর্কে অনুসারী উম্মাহর কোনো কোনো সদস্যের লেখালেখি ও বক্তৃতা-বিবৃতিতে অসাবধানী শব্দ নির্বাচনের বিপরীতে কাব্যে ও প্রবন্ধে তার অবস্থান। তাঁর কলম নিবেদিত স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য। দেশে-বিদেশে বহু সংবর্ধনা-সম্মাননা পদক-পুরস্কারে ভূষিত কবির বয়স ৮৪ চলছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত তার এ সাক্ষাৎকার পরওয়ানা'র সত্যসন্ধানী পাঠক-পাঠিকাদের জন্য জাতীয় জীবনে উজ্জীবন-উত্তরণ চিন্তার সহায়ক হতে পারে। -সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি

পরওয়ানা: আপনি কবি। কবি ও কবিতা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিকোণ এবং এ প্রেক্ষিতে আপনার কবিতা তথা সাহিত্যক্ষেত্রে ভূমিকা সম্পর্কে মাসিক পরওয়ানার পাঠক-পাঠিকাদের জন্য কিছু বলবেন?

আবদুল মুকীত চৌধুরী: শুরুতে এ বিষয় জিজ্ঞাসায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ধন্যবাদ। কোনো মুসলিম কবিকে অবশ্যই এ দৃষ্টিকোণের আওতায় কর্ম-পরিকল্পনা সাজাতে হবে। মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণের সৌভাগ্যে যেমন আমি আনন্দিত, গর্বিত; তেমনি কবি, লেখক, গবেষক হয়ে সাহিত্যে আল্লাহ তাআলা-রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শাশ্বত আদর্শের সৌন্দর্য, চিরন্তন কল্যাণ ও মুক্তি আমার অন্বেষা ও চর্চার বিষয় । আমার এ দৃষ্টিকোণের উৎস-সূত্র কালামুল্লাহ কুরআন মাজীদ। কবি ও কবিতা প্রাসঙ্গিক কুরআনের কিছুসংখ্যক আয়াতের উল্লেখ প্রয়োজন, যাতে বিশ্বাসী কবির ঐতিহ্যিক চিন্তাধারা ও অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় । সাহিত্যক্ষেত্রে উত্তরাধিকারের এই শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের অনুশীলন-চর্চা, কাব্য ও গদ্য সাহিত্য আমার শ্রেষ্ঠতম অবলম্বন। প্রসারিত ভাষ্যে মানব কল্যাণমূলক সাহিত্যকে আমরা আমাদের গরীয়ান অতীতের অংশ হিসেবেই দেখি। কুরআনুল করীমের সূরা আম্বিয়া, শুআরা, ইয়াসীন, সাফফাত, তুর এবং হাক্কা-তে রয়েছে কবি ও কাব্য প্রসঙ্গ।

আয়াতসমূহের অনুবাদ:

• তারা এটাও বলে, এ সব অলীক কল্পনা; হয় সে এটা উদ্ভাবন করেছে না হয় সে একজন কবি। অতএব সে আমাদের কাছে নিয়ে আসুক এক নিদর্শন যেরূপ নিদর্শনসহ প্রেরিত হয়েছিল পূর্ববর্তীগণ। *-(সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৫)*

• এবং কবিদেরকে অনুসরণ করে বিভ্রান্তরাই। তুমি কি দেখ না তারা উদভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়? এবং তারা তা বলে, যা তারা করে না। কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে ও অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে কোন স্থলে তারা প্রত্যাবর্তন করবে। *-(সূরা শুআরা, আয়াত: ২২৪-২২৭)*

• আমি রাসূলকে কাব্যরচনা করতে শিখাইনি এবং এটা তার পক্ষে শোভনীয় নয়। এটা তো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন। *-(সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ৬৯)*

• এবং বলতো, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের ইলাহগণকে বর্জন করবো? *-(সূরা সাফফাত, আয়াত: ৩৬)*

• ওরা কি বলতে চায়, সে একজন কবি? আমরা তার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি। *-(সূরা তূর, আয়াত: ৩০)*

• ওরা কি বলে, এই কুরআন তার নিজের রচনা? বরং ওরা অবিশ্বাসী। *-(সূরা তূর, আয়াত: ৩৩)*

• নিশ্চয়ই এই কুরআন এক সম্মানিত রাসূল (জিবরীল (আ.)-এর বহনকৃত বার্তা। এটা কোনো কবির রচনা নয়; তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর। এটা কোনো গণকের কথাও নয়; তোমরা অল্পই অনুধাবন কর। ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ। *-(সূরা হাক্কা, আয়াত: ৪০-৪৩)*

কুরাইশদের কথিত অলীক কল্পনা, উদ্ভাব, কবি, উন্মাদ কবি, কুরআন তার নিজের রচনা-এসবের জবাবে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ইহা কোনো কবির রচনা নয়, রাসূলের (জিবরীল (আ.)-এর বাহিত বার্তা)-আল্লাহ তাআলার কালাম।

আল্লাহ তাআলা কবিদের দৃষ্টিকোণ ও কাব্যকর্মের ভিত্তিতে একদিকে বিভ্রান্তও উদভ্রান্ত এবং অন্যদিকে বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদেরে রেখেছেন। বিশ্বাসী কবিদের সোচ্চার হওয়ার ক্ষেত্র সম্পর্কে বলেছেন.... অত্যাচারিত হবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এ প্রতিশোধ পেশী-শক্তি বা অস্ত্রশক্তির মুকাবিলা নয়, বিপক্ষের বিরূপ মিথ্যাচারের সমুচিত জবাবে কবিতা রচনা। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ্য, পার্থিব জীবনে মানুষের গুণাবলি ও বিশিষ্টতার উচ্চ মানবীয় দৃষ্টিসীমার অনেক উর্দ্ধে রাসূলুল্লাহর অবস্থান। তাঁর ক্ষেত্রে কবি'র ক্ষুদ্রত্বের বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কবি হওয়ায় কৃতিত্বের আদৌ কিছু নেই। আল্লাহ তাঁকে কবিতা রচনার যোগ্যতা দিলে তাঁর বিরুদ্ধবাদী কুরাইশরা এবং পরবর্তীকালে তাদের অজ্ঞ অনুসারীরা পবিত্র কুরআনকে তাঁর কাব্যকর্ম বা রচনা বলতে মোক্ষম মওকা ও যুক্তি পেয়ে যেতো। প্রাসঙ্গিক, অবিশ্বাসীদের প্রতি কুরআনের সূরার মত দশ সূরা, কমপক্ষে এক সূরা রচনায়ও তাদের অক্ষমতা, ব্যর্থতার পর এটা তো সকল বিরূপ-ভাষী অবিশ্বাসীর জন্য চিরকালের চ্যালেঞ্জ রয়েই গেল।

বিভ্রান্ত-উদভ্রান্তদের উপত্যকায় ঘুরে বেড়ানো কবিরা নয়- পবিত্র কুরআনের গ্রহণযোগ্যতা ও আনুগত্য তথা শিরোধার্যতা যেসব কবির প্রতি, "যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে এবং অত্যাচারিত হবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে"।

রাসূলুল্লাহ (সা.) পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে সত্য সুন্দর মানব-কল্যাণমূলক কাব্য রচনায় উৎসাহিত করেছেন এবং মিথ্যা অসুন্দর অমানবিক অকল্যাণের হোতা কবিতা রচনায় নিষেধ করেছেন। ইরশাদ করেছেন, "কবিতা ও সাধারণ কথার বিচার একই মানদণ্ডে হতে হবে। অনাবিল ও সত্যের সৌরভ-যুক্ত কথার যে মূল্য, পার্থিব কবিতারও সেই মূল্য। অমার্জিত বক্তব্য যেমন অপ্রীতিকর, অমার্জিত কবিতা ও তেমন"।-*(বুখারী শরীফ, আদাবুল মুফরাদ)।* হযরত আলী (রা.) সহ কোনো কোনো সাহাবী রাসূল (সা.)-কে কখনো কখনো কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন। আবৃত্তি শুনে তিনি জ্ঞানপূর্ণ মন্তব্য করতেন বলে পবিত্র হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। সমকালীন কবি, যারা ইসলামের শাশ্বত কল্যাণ ও মুক্তি-বার্তায় কলম ধরেছিলেন, তাদেরকে তিনি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন। কবি হাসসান বিন সাবিত (রা.)-কে শাইরুর রাসূল বা রাসূলের কবি'র মর্যাদায় ভূষিত করে তার জন্য মসজিদে নববীতে পৃথক মিম্বর তৈরি করেন। কবি কাব বিন যুহাইর (রা.)-কে চাদর উপহার দেন। বিধর্মীদের পক্ষ থেকে ইসলামের প্রতি ভিত্তিহীন নিন্দাবাদের বিপরীতে কবিতা রচনার জন্য স্বয়ং রাসূল (সা.) হাসসান বিন সাবিত, কাব বিন মালিক ও আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.)-কে নির্দেশ দেন। কবিদেরকে তিনি ভাষার বিশুদ্ধতা ও শব্দ ব্যবহারে যত্নশীল হতে-যথাযথ শব্দ চয়নের জন্য বলতেন।

এ সাক্ষাৎকারে জাতীয় মাসিক পরওয়ানা কর্তৃপক্ষকে আমার বক্তব্য উপস্থাপনের একটি দিক সম্পর্কে বলা প্রয়োজন। সাহিত্য-কর্ম ও ব্যক্তিগত ভূমিকার তাত্ত্বিক ও তথ্য বিষয়ক জবাবে আমার গ্রন্থাবলির সংশ্লিষ্ট অংশ, সম-সাময়িক পত্রিকা ও আনুষঙ্গিকতার ওপর আমাকে নির্ভর করে বলতে হবে। সঠিক জবাব হতে পারে এসব থেকেই। বয়সের এ পর্যায়ে স্মৃতি থেকে বলায় অনেকটা অপারগতার জন্য আমি বলে নিতে চাই। এটি আপনাদের অনুমতি সাপেক্ষ।

পরওয়ানা: ধন্যবাদ। তত্ত্ব ও তথ্যের সমর্থনে বই পত্র-পত্রিকা ও আনুষঙ্গিকই এই বয়সে স্মৃতি থেকে বলার চেয়ে ভাল সহায়ক হবে। পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর আলোকপাতের পর বিশ্বাসী কবি আপনার আল-আসমাউল হুসনা ও আসমাউন নবী নাম-কাব্য সম্পর্কে পরওয়ানার পাঠক-পাঠিকারা আগ্রহী হবেন।

আবদুল মুকীত চৌধুরী: আমার চিন্তা-চেতনায় পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর আদর্শে মুসলিম উম্মাহর উজ্জীবন উত্তরণের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা দীর্ঘকাল লালিত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও সায়্যিদুল মুরসালীন বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম-কাব্য বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানের চেতনার ভিত্তি-ভূমি তথা কালিমায় সূচনার কাজ করতে পারে। আমার লিখিত আল আসমাউল হুসনা ও আসমাউন নবী। আল্লাহ জাল্লা শা-নুহু ও বিশ্বনবী (সা.) নাম-কাব্য লতিফিয়া ফাউন্ডেশন, ঢাকা থেকে ১৪৪১ হিজরী/ অগ্রহায়ণ ১৪২৬/ নভেম্বর ২০১৯-এ প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থ প্রকাশে আপনি (অধ্যাপক আহমদ হাসান চৌধুরী) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাত্ত্বিক ও তথ্যগত সহায়তা করেছেন। মূলানুসারী করার কাজে আপনার সহযোগিতা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। আল্লাহ তাআলার যাতী একটি ও সিফাতী ৯৯টি নামের প্রতি নামে দুই পঙক্তি করে- ১০০×২= দুইশত এবং ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন সুলাইমান আল-জাযুলী (রহ.)-এর 'দালাইলুল খাইরাত'-এ বর্ণিত বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা)-এর দুইশত নামের ভিত্তিতে চারশত, মোট ছয়শত পঙক্তির এই কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশকের কথায় বলা হয়, ".....বিশেষত, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব, মহানত্ব, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শান-মর্যাদা প্রসঙ্গে তার শব্দচয়নের অভীপ্সা ও দক্ষতা বিস্ময়কর"। "..... বাংলা ভাষায় আল আসমাউল হুসনা ও আসমাউন নবী অবলম্বনে প্রতি নামে এ বিষয়ে আলোকপাতধর্মী কথা সম্বলিত কাব্যগ্রন্থ আমরা এ যাবৎ দেখিনি। আরব বিশ্বে নাম-কাব্য প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। ফার্সী, উর্দূ বা ইংরেজি ভাষায় এ ধরনের প্রকাশনা সন্ধান ও প্রাপ্তি সাপেক্ষ। এ প্রেক্ষিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা ও মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর (২০০+৪০০)= ছয়শত পঙক্তির নাম-কাব্য ব্যতিক্রমী পর্যায়ের বলেই মনে হচ্ছে। বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচনের শব্দবহুল কাব্যে পথিকৃৎ পর্যায়ের সৃজনশীল কবির এ নাম-কাব্য তাঁর আরেকটি অগ্রণী অবদান হিসাবে বোদ্ধা আলোচক মহলে অভিনন্দিত হবে, আমাদের প্রত্যাশা"।

এ প্রকাশনা সম্পর্কে আমার ভূমিকা থেকে যোগ করি, ".....এ নাম-কাব্য প্রকাশে তাঁর উদ্যোগ আল্লাহ ও রাসূল-প্রাণ বাঙালি পাঠক-পাঠিকাদের জন্য এক সুসংবাদ। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে তিনি আমার বিশ্বনবী (সা.)-উম্মাহ কাব্য ও শিশু-কিশোর কাব্য 'আলোর ভুবন' প্রকাশ করেছেন। সামগ্রিক এই প্রেক্ষিতে ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (র.)-এর পরিবারের নেতৃত্বে সমাসীন আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী বড় ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী ও পরিবারবর্গের প্রতি বিনীত কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।"

এ গ্রন্থ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও বিশ্বনবী (সা.)-এর প্রেমিক মুসলিম উম্মাহর সদ্যস্যবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসায়, মরহুমদের মাগফিরাত ও নাজাত এবং জীবিতদের দুনিয়ার কল্যাণ এবং পরকালে মাগফিরাত ও নাজাত কামনায় সমর্পিত। (চলবে...) প



হুথি-সৌদি সংঘাত ইরান যুদ্ধের ধারাবাহিকতা নাকি ইয়েমেন সংকটের নব পর্যায়?

মুহাম্মাদ বিন নূর

গত জুলাইয়ে ইয়ামানের সানআ বিমানবন্দরে সৌদি জোটের হামলার পর সৌদি আরব এবং ইয়ামানের হুথিদের মধ্যে যে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে, তা আসলে ইরানে মার্কিন আগ্রাসনের ফলে শুরু হওয়া মধ্যপ্রাচ্য সংকটেরই একটি নতুন ফ্রন্ট, নাকি ইয়ামানে এক দশকেরও বেশি সময় থেকে চলমান সংকটের নব পর্যায়, এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বেশ কঠিন।

পুরো বিষয়টি সহজভাবে দেখলে- ইয়ামানের হুথিগোষ্ঠী এবং সৌদি তথা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ইয়েমেন সরকারের মধ্যে ২০১৫ সাল থেকে যে গৃহযুদ্ধ চলছিল, সৌদি আরব সে যুদ্ধকে ইয়ামানের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে না দেখে সরাসরি তাতে অংশ নেয়। স্বভাবতই হুথিরাও জবাবে মূল সৌদি ভূখণ্ডে বিভিন্ন সময় আক্রমণ চালিয়েছে।

অবশেষে ২০২২ সালে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ইয়ামানের অভ্যন্তরে উভয়পক্ষের মধ্যে সাময়িক যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়িত হয়। সে যুদ্ধবিরতি চুক্তি পরবর্তীতে আর নবায়ন না হলেও এর মাধ্যমে যে 'আপেক্ষিক শান্তি' প্রতিষ্ঠা হয়, তা মোটামুটি টেকসই ছিল বলা চলে। এরপর ২০২২-২৩ সালে ওমান ও চীন মধ্যস্থের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। একদিকে মাসকাটে হুথিদের সঙ্গে সৌদিদের সরাসরি শান্তি আলোচনা, অন্যদিকে বেইজিংয়ে ইরান-সৌদি সমঝোতা ও কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার চুক্তি, সব মিলিয়ে সৌদি-ইয়ামানের মধ্যে এক ধরনের স্থিতাবস্থা তৈরি হয়।

তাতে ইয়ামানের পরিস্থিতি যে খুব স্বাভাবিক হয়েছিল, তা নয়— কিন্তু খানিকটা স্বস্তিদায়ক হয়েছিল তো বটেই। এমনকি হুথি নিয়ন্ত্রিত সানআর বিমানবন্দর থেকে হজ্জযাত্রীদের ফ্লাইট সৌদিতে গমন করতো, যদিও সে বিমানবন্দরের নিয়ন্ত্রণ খুব স্পষ্ট ছিল না, কিন্তু বাস্তবে হুথিদের এলাকাতেই সেটির অবস্থান। ২০২৩ থেকে ২০২৬ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই স্থিতাবস্থা বজায় থাকার পেছনে একই সঙ্গে ইয়ামানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি, হুথিদের প্রধান মিত্র ইরানের সাথে সৌদির মোটামুটি সুসম্পর্ক, হুথিদের সাথে সৌদিদের এক ধরনের সমঝোতা — সবকিছুরই সম্মিলিত ভূমিকা ছিল।

এর মধ্যে হুথিদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। আল-আকসা'র তুফান শুরু হলে হুথিরা গাযার প্রতিরোধযোদ্ধাদের সমর্থনে বাব এল-মান্দেব অবরোধ করে। এতে ইসরায়েলের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের সাথেও হুথিদের মুখোমুখি সংঘর্ষ শুরু হয়। কিন্তু ২০২৫ সালের মে মাসে প্রায় কোনও পক্ষকেই না জানিয়ে, বিশেষত ইসরায়েলের সাথে কোনও ধরনের আলোচনা ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্র হুথিদের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে প্রবেশ করে। হুথিগোষ্ঠীর সাথে এটি ছিল প্রথম কোন মার্কিন সমঝোতা। তখন এই ঘটনায় ইসরায়েল প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলেও সৌদির তাতে বিশেষ কোন আপত্তি ছিল না, যেহেতু তারাও হুথিদের সাথে কোনও ধরনের সংঘর্ষের মধ্যে ছিল না।

পুরো পরিস্থিতি বদলে যায় ২০২৬ সালে, ইরানে মার্কিন আগ্রাসনের পর। হুথিরা যদিও ইরানের আওতাধীন কোন সশস্ত্র গোষ্ঠী নয়, তাদের নিজেদের স্বকীয় কৌশল আছে, স্বার্থ আছে, সে অনুযায়ী প্রতিটি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, কিন্তু তারা যে ইরানের ঘনিষ্ঠ মিত্র, তা তো সকলেরই জানা। ফলে ইরান সৌদিসহ উপসাগরীয় রাষ্ট্রসমূহের উপর হামলা শুরু করলে স্বভাবতই সৌদির নযর পড়ে হুথিদের ওপর।

তখনও হুথিরা ইরানের সমর্থনে একটি গুলিও ছোড়েনি— সৌদিকে লক্ষ্য করেও না, বাব এল-মান্দেব অবরোধের জন্যও না। যদিও ইরান হরমুজ অবরোধের পর থেকেই বলে আসছিল, প্রয়োজনে আরেকটি জলপথও অবরোধ করা হবে, স্পষ্টতই তাদের ইঙ্গিত ছিল হুথিদের সহায়তায় বাব এল-মান্দেব অবরোধের দিকে।

এই পরিস্থিতিতেই ইয়ামানের ভিতরেও পরিস্থিতি খানিকটা বদলাতে শুরু করে, সৌদি সমর্থিত শাসক এবং হুথিগোষ্ঠী উভয়েই নিজেদের সামরিক নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির চেষ্টা শুরু করে, দেশটির অভ্যন্তরের যে স্থিতাবস্থা চলছিল ২০২৩ সাল থেকে, তাতে কিছুটা পরিবর্তন আসে, সেই সাথে হরমুজ বন্ধ হওয়াতে বাব এল-মান্দেবের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় সকল পক্ষের নিকটই।

ইরান যুদ্ধ এবং ইয়ামানের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য বদলের ফলে হুথিদের সামরিক সক্রিয়তার একটি সম্ভাবনা যখন তৈরি হয়েছে, সেই মুহূর্তে হুথি নিয়ন্ত্রিত এলাকায় সানআ বিমানবন্দরে সৌদি সমর্থিত জোটের আক্রমণের ফলে উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পায়। হুথিদের দৃষ্টিকোণ থেকে ইরানের সর্বোচ্চ নেতার দাফনে অংশগ্রহণ করতে যাওয়া প্রতিনিধি দলের বিমান অবতরণে বাধা দেওয়া শুধু রাজনৈতিকই নয়, ধর্মীয় দিক থেকেও অত্যন্ত সংবেদনশীল।

আবার সৌদি আরব ও সৌদি সমর্থিত ইয়ামানেরে সরকারের জন্য চলমান পরিস্থিতিতে সানআর সাথে ইরানের সরাসরি বিমান যোগাযোগ কৌশলগত ঝুঁকির কারণ বলে বিবেচিত হচ্ছিল। সৌদি সমর্থিত সরকার এই পরিস্থিতিতে হুথি প্রতিনিধি

দলের দেশে ফেরার জন্য ইয়ামানী এয়ারলাইন্স ব্যবহারের প্রস্তাব দিলে হুথিরা তা প্রত্যাখ্যান করে। হুথিরা ইরানের মাহান এয়ারের ফ্লাইটে সানআয় অবতরণ করতে চাইলে সৌদি সমর্থক জোট তা প্রত্যাখ্যান করে।

আপাতদৃষ্টিতে ২০২৬ সালে সৌদি-হুথি সংঘর্ষের প্রত্যক্ষ সূচনাবিন্দু এই ঘটনা। জুলাই থেকে শুরু হওয়া এই সংঘর্ষ সেপ্টেম্বরে এসে বেশ ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। সানআ বিমানবন্দরের বিপরীতে সৌদির আবহা বিমানবন্দরে হুথিরা হামলা চালালেও ঘটনা সেখানে থেমে থাকেনি। সৌদি আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে হুথিরা হামলা চালায়। এর মধ্যে কৌশলগত দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে সৌদি আরবের পূর্ব-পশ্চিম পাইপলাইনে ড্রোন হামলা। এই হামলা ইরাকের অভ্যন্তর থেকে হয়েছে বলে ধারণা করা হলেও কিন্তু হুথিদের সংশ্লিষ্টতা বিশ্লেষকদের চোখে একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। বিশষত ইরানের নেতৃত্বাধীন "প্রতিরোধ অক্ষের" প্রতিটি শক্তি আসলে ইরান, ইরাক, ইয়ামান, লেবানন সব দেশের ভিতরেই কমবেশি সক্রিয়। কাজেই ইরাকের অভ্যন্তর থেকেও হুথি হামলা একেবারে অসম্ভব নয়। আবার ইরাকের স্থানীয় ইরানপন্থী মিলিশিয়াদের দ্বারাও এ ঘটনা ঘটার বিষয়টি উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

হরমুজ অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায় এই পূর্ব-পশ্চিম পাইপলাইন ছিল সৌদি আরবের তেল রফতানির প্রধান মাধ্যম। ধারণা করা হচ্ছিল ইরানের জ্বালানি অবকাঠামোতে চূড়ান্ত আক্রমণ হলেই কেবল এই পাইপলাইন আক্রান্ত হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে তার আগেই এ হামলা সৌদি আরবের তেল রফতানিকে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয়। এই হামলা হুথিদের দ্বারা হয়েছে কিনা, তা নিশ্চিত না হলেও বাব এল-মান্দেবে সৌদি জাহাজের বিরুদ্ধে অবরোধ ঘোষণা, ইয়ানবু ও জাযানে সৌদি জ্বালানি অবকাঠামোতে হুথিদের হামলা, আরামকোসহ আরো বিভিন্ন অবকাঠামোতে হুথিদের হামলার বিষয়সমূহ হুথিরাই নিশ্চিত করেছে। এই প্রতিটি ঘটনার প্রত্যক্ষ সূচনাবিন্দু সানআ বিমানবন্দরে সৌদি হামলা, কিন্তু বাস্তবে ইরান যুদ্ধের ধারাবাহিকতা থেকে এ সকল ঘটনাকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দেখার সুযোগ খুবই কম। যদিও ইরান এখন কিছুটা কৌশলগত দূরত্ব বজায় রাখতে চাচ্ছে এসব কিছু থেকে।

হরমুজ অবরুদ্ধ, পূর্ব-পশ্চিম পাইপলাইন বিধ্বস্ত– এই অবস্থায় সৌদির হাতে আর একটি মাত্র বিকল্প পথ অবশিষ্ট থাকে, সেটি হচ্ছে বাব এল-মান্দেব। বাব এল-মান্দেবের আশপাশে আগে থেকেই হুথিদের কৌশলগত অবস্থান ছিল, ২০২৬ সালে এসে সে অবস্থান আরো শক্তিশালী হয়েছে, এবং তারা সৌদির বিরুদ্ধে অবরোধ ঘোষণা করেছে! ফলে উপসাগরীয় অঞ্চলে সৌদি আরবের তেল রফতানির জন্য অনেকগুলো বিকল্প রাস্তার যে কৌশলগত সুবিধা, ইরান ও তাদের মিত্রদের দ্বারা সেই সব কয়টি বিকল্পই বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

হুথিদের বিরুদ্ধে সৌদি আরব এবং সৌদি সমর্থিত ইয়ামান সরকার বলা চলে সেপ্টেম্বরে এসে পূর্ণ মাত্রায় যুদ্ধে ফিরে যায়। ২০২২-২০২৩ সাল থেকে যে স্থিতাবস্থা কার্যকর ছিল, তা পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। ইয়ামানের ভিতরে যেমন দুই ইয়ামানী পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ এবং বিভিন্ন এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লড়াই চলছে, একইভাবে সৌদি আরবও আবার সরাসরি এই যুদ্ধে পূর্ণ মাত্রায় অংশ নিচ্ছে। জবাবে হুথিরাও সৌদি আরবে হামলা চালাচ্ছে নিয়মিত।

এই পরিস্থিতিতে হুথিদের কয়েকটি ড্রোন হামলা নিয়ে বেশ আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়। সৌদি আরবের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় এসকল ড্রোন "মক্কা শরীফের দিকে" যাচ্ছিল, পথিমধ্যে আটকানো হয়েছে। এধরনের অভিযোগ অবশ্য ২০১৬-১৭ সালেও শোনা গিয়েছিল। হুথিরা স্পষ্টত সৌদিদের এ দাবি অস্বীকার করে জানায় যে, তাদের প্রকৃত লক্ষ্যবস্তু মক্কা নগরী নয়, বরং সৌদি আরবের জ্বালানি ও সামরিক অবকাঠামো।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো উভয়পক্ষের দাবির মধ্যে শব্দগত তফাত রয়েছে। সৌদির মূল দাবি মক্কার "দিকে" ড্রোন যাচ্ছিল, মক্কার "নিকটে" সেসকল ড্রোন ভূপাতিত হয়েছে। ভৌগলিক কারণে ইয়ামান থেকে মক্কা শরীফ ছাড়াও জেদ্দা, তায়েফ কিংবা ইয়ানবু অঞ্চলে ড্রোন হামলা করলেও মক্কার "দিকে" এবং মক্কার "নিকটে" কথা দুটি সত্য হতে পারে, কিন্তু এর মাধ্যমে মক্কা শরীফকে লক্ষ্য করে হামলা প্রমাণিত হয় না।

অন্যদিকে হুথিদের মূল দাবি হচ্ছে তারা মক্কার "উদ্দেশ্যে" কোন ড্রোন হামলা করেনি। ফলে উভয় বিবৃতি শাব্দিক দিক থেকে সঠিক হওয়া সম্ভব, যদিও উভয়পক্ষের মূল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি বয়ান প্রতিষ্ঠা করা। উল্লেখ্য সামরিক, জ্বালানি ও অর্থনৈতিক অবকাঠামোর অবস্থান বিবেচনায় হুথিরা জেদ্দা, তায়েফ কিংবা ইয়ানবু অঞ্চলে হামলা করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে তারা এসকল লক্ষ্যবস্তুর কথা স্বীকারও করেছে।

কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সৌদির পক্ষে বয়ান নির্মাণের ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অদ্ভুত সক্রিয়তা লক্ষ্য করা গেছে। সম্পূর্ণ ভূরাজনৈতিক একটি পরিস্থিতিকে মাত্রাতিরিক্ত ধর্মীয় রূপ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের বয়ান প্রচার এবং এ সকল বয়ানের সপক্ষে ভুয়া ভিডিও প্রচারও লক্ষণীয়। যদিও এগুলো সরাসরি সৌদি সরকারের প্রচারণা নয়, মূলত সৌদি আরব যে বয়ান ছড়াতে তাদের অবস্থান ঠিক করেছে, সে বয়ানের পক্ষেই সৌদিপন্থীদের এসব প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। ইয়ামানে সৌদি আরবের ভূমিকা কতটা নৈতিক, সে আলোচনা না করেই পবিত্রভূমির যুক্তিতে সৌদির বিরুদ্ধে কোন ধরনের আক্রমণকে ধর্মীয় ভাবাবেগের সাথে মেশানোর এক ধরনের প্রচেষ্টা শুধু আরব বিশ্বেই নয়, বাংলাদেশেও যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

যদিও মধ্যপ্রাচ্যের মূল যুদ্ধ পরিস্থিতিতে এসব পার্শ্ববর্তী বিষয়। ইসরায়েলের আহ্বানে ইরানের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপিয়ে দেওয়া অবৈধ যুদ্ধের পারিপার্শ্বিক ঘটনা হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যে অনেক ঘটনাই ঘটছে। ইয়ামানের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি আংশিক সত্য, পাশাপাশি তাদের অভ্যন্তরীণ হিসাব-নিকাশও এক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ যে এবারের যুদ্ধেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং হুথিদের মধ্যে ২০২৫ সালে সম্পন্ন শান্তিচুক্তি অব্যাহত রয়েছে, এবং এটি যুক্তরাষ্ট্র ও হুথি— উভয়পক্ষের আগ্রহেই অব্যাহত রাখা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র হুথিদেরকে আপাতত ইরানের মিত্র হিসেবে না দেখে সৌদি আরবের নিজস্ব সমস্যা হিসেবে দেখছে, হুথিরাও শক্তিশালী মিত্র ইরানের জন্য সুবিধা করে দিতে চাইলেও সেটা কেবলই সৌদি আরবের বিরুদ্ধে নিজেদের হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন করার মাধ্যমেই করবে, যুক্তরাষ্ট্র কিংবা অন্য কারো মুখোমুখি হতে অন্তত এখনো তারা আগ্রহী নয়। ফলে ইয়ামানের বর্তমান পরিস্থিতিকে ইরান যুদ্ধের ধারাবাহিকতা নাকি ইয়ামান সংকটের নব পর্যায় কোনটাই এক কথায় বলা সম্ভব নয়। আর সে জন্যই, এ সংকটের সমাধানও তুলনামূলক জটিল আকার ধারণ করেছে।

সাময়িক

বিদআত
ধারণা ও বিশ্লেষণ

মো. জিয়াউর রহমান

(পূর্ব প্রকাশের পর)

ইবন হাজার (র.) ফাতহুল বারী (২/২৮৭)-এ রিফাআহ ইবনু রাফি (রা.)-এর হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এই হাদীস দ্বারা (নফল) নামাযের মধ্যে এমন নতুন যিকর সৃষ্টি করার বৈধতার প্রমাণ গ্রহণ করা হয়েছে, যা মাছুর যিকরের বিরোধী নয়। এবং এমন যিকর উচ্চস্বরে বলারও বৈধতা রয়েছে, যতক্ষণ তা অন্য মুসল্লিদের জন্য বিঘ্ন সৃষ্টি না করে।

এই মতের পক্ষে জমহুর উলামায়ে কিরাম রয়েছেন। তন্মধ্যে অন্যতম-

القسطلاني في شرح البخاري ٢/٢٧٥

والشرقاوي في شرح مختصر الزبيدي ١/١٨٢

والباحي في المنتقى شرح الموطأ ١/٤٥٣

والزرقاني في شرحه على الموطأ ٢/٩٢

والكاندهلوي في أوجز المسالك ٤/٥٥١

وصديق حسن خان في عون الباري شرح البخاري ٢/٧٦٢

والنووي في شرح مسلم ٧١/٧١

সারকথা

মুকাইয়্যাদকে মুতলাক বা মুতলাককে মুকাইয়্যাদ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে এক কথায় বলা যায়:

মুকাইয়্যাদ বিষয় দুই প্রকার—

প্রথমত: এমন মুকাইয়্যাদ, যার নির্দিষ্টকরণই শরীআতের উদ্দেশ্য এবং সেটিই মূল বিষয়। এ ধরনের মুকাইয়্যাদকে সাধারণ করে দেওয়া জায়িয নয়।

দ্বিতীয়ত: এমন মুকাইয়্যাদ, যার নির্দিষ্টকরণ শরীআতের মূল উদ্দেশ্য নয়। এ ধরনের মুকাইয়্যাদকে সাধারণ করে দেওয়া অধিকাংশ আলিমের নিকট জায়িয—তা অতিরিক্ত কোনো বিষয় যোগ করার দিক থেকে হোক অথবা নির্দিষ্ট বিষয়টির পরিবর্তে অন্য কিছু করার দিক থেকে হোক।

তবে সবার মতেই অধিক উত্তম হলো—মূল নির্দিষ্ট বিষয়টিকে পরিবর্তন না করা। (আল বিদআতুল মাহমুদাহ, ১৭৫)

সাহাবা (রা.) তাবিঈন ও তাবয়ে তাবিঈনগণ (র.) অনেক মুতলাক আমলকে মুকাইয়্যাদ এবং মুকাইয়্যাদ আমলকে মুতলাক করেছেন অথবা তাঁদের উপস্থিতিতে তাঁদের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার আপত্তি ছাড়াই যেসকল কাজ করা হয়েছে তা বিদআত নয়।

মনে রাখা উচিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যামানাতে যে বিষয়টি বিদ্যমান ছিলো, চাই তা স্বয়ং নবীজি নিজে করেছেন বা তাঁর সাহাবায়ে কিরাম করেছেন আর তিনি উক্ত কাজের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন, সেক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমেই উক্ত বিষয়টি বিদআত নয়। আর যা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যামানায় ছিলো না বরং তাঁর পরে যা সৃষ্টি হয়েছে তা শাব্দিকভাবে ব্যাপকার্থে বিদআত অর্থাৎ সাধারণভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যামানার পরে নতুন সৃষ্টি হওয়ার বিবেচনায় তা বিদআত।

এটা দুই প্রকার তথা-

এক. বিষয়টি হয়তোবা অভ্যাসগত বিষয় নতুবা,

দুই. ইবাদতগত বিষয়।

যদি প্রথম প্রকার হয় তবে শরঈ কোনো দলীল তার কদর্যতার উপর প্রমাণ প্রদান না করা পর্যন্ত উক্ত কাজটি মৌলিকভাবেই গোমরাহী বিদআত বলে গণ্য হবে না।

আর দ্বিতীয় প্রকার তথা যা ইবাদত সংশ্লিষ্ট বিষয় তার কয়েক অবস্থা হতে পারে। যথা-

ক. হয়তোবা তা সাহাবায়ে কিরামগণের যামানায় সৃষ্টি হয়েছে, সকল সাহাবা উক্ত কাজটি করেছেন বা তাঁদের কেউ কেউ করেছেন অথবা সাহাবাদের যামানায় তাঁদের অবগতিতেই উক্ত কাজটি করা হয়েছে।

খ. অথবা তাবিঈগণের যামানাতে বিষয়টি নতুন সৃষ্টি হয়েছে।

গ. বা তাবয়ে তাবিঈগণের যামানাতে

বিষয়টি নতুন সৃষ্টি হয়েছে।

ড. অথবা তাবয়ে তাবিঈগণের যামানা পরবর্তী আমাদের পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে বিষয়টি নতুন সৃষ্টি হয়েছে।

এখন 'ক' তথা যা সাহাবা যামানাতে নতুন সৃষ্ট বিষয়টি আবার দুই প্রকার।

এক. এ নতুন সৃষ্ট বিষয়ে সাহাবাগণ থেকে কোনো প্রকার আপত্তি বা অপছন্দনীয় হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাবে। (যেমন- ঈদের নামাযের আগে খুতবা পাঠ)। দুই. সাহাবাগণ বিষয়টি জানার পরও তাঁদের থেকে কোনো প্রকার আপত্তি বা তাঁদের 'অপছন্দ' হয়েছে বলে কোনো বর্ণনা পাওয়া যাবে না।

(যেমন- জুমুআর প্রথম আযান, রামাদান মাসের রাত্রিতে বিশ রাকআত তারাবীর জন্য একত্রিত হওয়া ইত্যাদি)

কিছুসংখ্যক সাহাবা তাঁদের যামানাতে উদ্ভাবিত কিছু নতুনসৃষ্ট বিষয়াবলিকে বিদআত নামে আখ্যায়িত করেছেন। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, নতুন সৃষ্ট বিষয়ে তাঁরা বিদআত বলার সাথে সাথে উক্ত বিষয়ের প্রতি তাঁদের কর্ম বা বক্তব্য জাতীয় কোন প্রকার অপছন্দের আলামত যদি পাওয়া যায়, তাহলে এ অপছন্দনীয় হওয়াটা-ই নতুনসৃষ্ট বিষয়টি সাহাবায়ে কিরামের নিকট নিকৃষ্ট হওয়ার প্রমাণ প্রদান করবে।

আর যদি নতুনসৃষ্ট বিষয়টি তাঁরা বিদআত বলার সাথে উক্ত বিষয়ের প্রতি তাঁদের অপছন্দের কোন আলামত না থাকে, বরং এমন আলামত থাকে যা তাঁদের পছন্দের উপর প্রমাণ প্রদান করে তাহলে প্রমাণিত হবে 'বিদআত' দ্বারা তাঁরা 'আম' তথা ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। অর্থাৎ নতুনসৃষ্ট বিষয়ই শুধু বুঝিয়েছেন। ঐ বিদআত উদ্দেশ্য করেননি যা গোমরাহী। (আর সাহাবাদের অনুসরণ নবী ﷺ আমাদের উপর আবশ্যক করেছেন, সুতরাং তারা যেই কাজ করেছেন তাতে অনুসরণ করা জরুরি)।

তাবিঈদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ, তাঁদের জামানায় সৃষ্ট কোনো নতুন বিষয়ের ব্যাপারে তাঁদের পক্ষ থেকে আপত্তি পাওয়া যায় তবে তা বিদআত বলে গণ্য হবে, অন্যথায় তা বিদআত হবে না।

আর তিন যামানার পরে যে সকল নতুন বিষয় এসেছে সেগুলোকে 'আদিল্লাতে শরঈয়্যাহ' তথা শরঈ দলীলের মানদণ্ডে দাঁড় করাতে হবে। শরঈ মানদণ্ডে যাচাই করে যদি বরকতময় তিন যুগে তার কোনো নযীর তথা সাদৃশ্য পাওয়া যায় অথবা সেটা যদি শরঈ মূলনীতি থেকে কোনো একটা মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় তবে তা বিদআত হবে না। (ইসলামে অধিক নফল ইবাদাতের রূপরেখা ৬৬, ১০০)

রাসূল ﷺ এর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কিরামের কিছু আমল

সহীহ বুখারী ১/৩৮৬ এবং সহীহ মুসলিম ৪/১৯১০-এ আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে-

রাসূলুল্লাহ (সা.) ফজরের নামাযের সময় বিলাল (রা.)-কে বললেন, হে বিলাল! ইসলাম গ্রহণের পর সর্বাধিক সন্তুষ্টিব্যঞ্জক যে আমল তুমি করেছ তা আমার নিকট বলো- কারণ আমি জান্নাতে আমার সামনে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পেয়েছি।

বিলাল (রা.) বললেন, আমি যখনই রাত বা দিনের কোনো সময় উত্তমরূপে উযূ করেছি, তখন সেই উযূ দ্বারা আমার জন্য যতটুকু নামায পড়া সম্ভব হয়েছে, আমি তা পড়েছি। আমার কাছে এর চাইতে (অধিক) আশাব্যঞ্জক হয়, এমন কোনো বিশেষ আমল আমি করিনি।

হাদীসটি থেকে আলোচ্য বিষয়

বিলাল (রা.) উযূর সঙ্গে নামাযকে একটি নির্দিষ্ট নিয়মের মাধ্যমে সম্পৃক্ত করেছিলেন। অর্থাৎ, তিনি যখনই উযূ করতেন, তখন সেই উযূর পর দুই রাকআত নফল নামায আদায় করতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এই আমলকে নিষেধ করেননি; বরং তা অনুমোদন করেছেন, প্রশংসা করেছেন এবং এর ফদীলত প্রকাশ করেছেন।

ইবনু হাজার (র.) ফাতহুল বারী ৩/৩৪-এ বলেন, এই হাদীস থেকে ইবাদতের জন্য সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। কারণ বিলাল (রা.) নিজস্ব ইস্তিনবাত ও ইজতিহাদের মাধ্যমে উক্ত আমলের জন্য এ সময় নির্ধারণে পৌঁছেছিলেন। অতঃপর নবী (সা.) তাঁর সেই ইজতিহাদকে সঠিক বলে অনুমোদন করেছেন।

আবু শামা (র.) আল বায়িস গ্রন্থের ২৪ পৃষ্ঠায় বলেন, উত্তম বিদআতের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে এটিও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল (রা.)-কে প্রত্যেক উযূর পর দুই রাকআত নামায আদায় করার ব্যাপারে অনুমোদন দিয়েছেন। যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের কথা বা কাজের মাধ্যমে প্রত্যেক উযূর পর দুই রাকআত নামায আদায়ের কোনো বিশেষত্ব নির্ধারণ করে দেননি। এর কারণ হলো, নফল নামাযের ক্ষেত্রটি মূলত উন্মুক্ত; তবে যেসব সময়ে নামায পড়া মাকরূহ, সেগুলো এর ব্যতিক্রম।

এরই অনুরূপ আরেকটি ঘটনা হলো— রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্য একজন সাহাবীকে অন্যান্য সূরার পরিবর্তে নিয়মিত শুধু قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ অর্থাৎ সূরা ইখলাস পড়ার ব্যাপারেও অনুমোদন দিয়েছিলেন।

ড. আবদুস সামী আল-আনীস তাঁর গবেষণাপত্রে, যা মাজাল্লাতুল আহমাদিয়্যাহ-তে প্রকাশিত হয়েছে (পৃষ্ঠা ১৯৫), বলেন: তবে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই দুই রাকআত নামাযের ব্যাপারে তো নবী ﷺ অনুমোদন দিয়েছেন। আর নবী ﷺ-এর অনুমোদন সুন্নাহর একটি প্রকার। তাহলে এ ঘটনা দ্বারা দলীল গ্রহণের দিকটি কী?

এর উত্তর হলো: নবী ﷺ শুধু দুই রাকআত নামায আদায় করাকেই অনুমোদন করেননি; বরং তিনি দুই রাকআত নামায আদায়ের পাশাপাশি এর জন্য সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিলাল (রা.)-এর ইজতিহাদকেও অনুমোদন করেছেন। যদি তাঁর এই ইজতিহাদ অনুমোদিত না হতো, তাহলে নবী ﷺ তাঁকে বলতেন—তুমি এ বিষয়ে আমার কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়ার আগেই কেন এটি করলে?

ফাতহুল বারী ২/২৫৮- তে রয়েছে, নাসিরুদ্দীন ইবনুল মুনীর (র.) বলেন: এ হাদীসে (নামাযে সূরা ইখলাস নিয়মিত পড়া) প্রমাণ রয়েছে যে, কোনো ব্যক্তির নিজের ভালো লাগার কারণে কুরআনের কোনো একটি অংশকে বিশেষভাবে নির্বাচন করা এবং তা বেশি বেশি পড়া জায়িয। এতে কুরআনের অন্যান্য অংশকে পরিত্যাগ করা বা অবহেলা করা বোঝায় না। (আল বিদআতুল মাহমুদাহ ৭৭)

এছাড়া আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) এর সূরা ফাতিহা ৭ বার পাঠ করে ফুঁক দেওয়া, খুবাইব বিন আদি (রা.) এর ২ রাকআত নামাযের প্রচলন ইত্যাদি আমল রাসূল ﷺ মন্দ বলেননি যদিও তারা নিজেরা ইজতিহাদ করে করেছিলেন এবং এর মূল ইসলামের মধ্যে ছিলো।

এটি ছিলো আল্লাহর নবী ﷺ এর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এর আমল। নবী পাক ﷺ এর ইন্তিকালের পর সাহাবায়ে কিরাম দ্বীনের প্রয়োজনে কিংবা অনেক মুতলাক আমলকে মুকাইয়্যাদ করেছেন যা রাসূল ﷺ এর যামানায় ছিলো না। এর উদাহরণ হচ্ছে হযরত উমর (রা.) এর তারাবীর নামাযকে নিয়মিত মসজিদে জামাআতের প্রচলন, হযরত উসমান (রা.) এর মাসহাফ সংকলন, হযরত ইবন উমর (রা.) এর তালবিয়াতে বাক্য বৃদ্ধি, আবূ মূসা আশআরী (রা.) এর নামাযের পরের দুআ,আনাস (রা.) এর কুরআন খতমের পর পরিবার নিয়ে দুআ মাহফিল, তুলুয়ে শামসের সময় হযরত হাসান (রা.) এর তাসবীহ পাঠ, আয়িশা (রা.) এর রাত্রের ঘুমানোর সময়ের আমল ইত্যাদি।

আলোচ্য প্রতিটি রিওয়ায়তের সনদ গ্রহনযোগ্য। (চলবে)

এই মাসে এই চাঁদে



পরওয়ানা ডেস্ক:

মুসলিম রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ ইন্তিকাল করেন

১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন যশোর জেলার অন্তর্গত মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার মাঝাইল গ্রামে তার জন্ম। পিতা সৈয়দ হাতেম আলী। পেশায় ছিলেন একজন একজন সৎ পুলিশ ইন্সপেক্টর। মায়ের নাম রওশন আখতার। পারিবারিক সূত্রেই তারা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ। সৈয়দ হাতেম আলী কোনো এক রামাদান মাসে প্রথম তারাবীহ পড়ে আসলেন। এবার ঘুমোতে যাবার পালা। সেহরীতে উঠতে হবে। এরমধ্যে তার সন্তানসম্ভবা স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেলেন। সবাই অস্থির। তবে কিছুক্ষণ অস্থিরতা কাটিয়ে খুশির সংবাদ আসলো। দ্বিতীয়বারের মতো পুত্র সন্তানের বাবা হলেন সৈয়দ হাতিম আলী। উযূ করে দুই রাকআত শুকরানা নামায পড়ে নিলেন। পুত্র সন্তানের জন্য দুআ করলেন। পুত্র সন্তানের নাম রাখা হলো সৈয়দ ফররুখ আহমদ। রামাদান মাসের প্রথম রাতে আগমনকে স্মরনীয় রাখতে ডাকনাম রাখা হলো–রমজান।

ফররুখ বড় হতে থাকেন। খুলনা জিলা স্কুল থেকে ১৯৩৭ সালে ম্যাট্রিক এবং কলকাতার রিপন কলেজ থেকে ১৯৩৯ সালে আই.এ পাস করেন। এরপর স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শন এবং ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। এরমধ্যে কবিতা লেখার প্রতি আকর্ষণ বাড়ে তার। বিশেষ করে সনেটের প্রতি। সেই সাথে আবূ রুশদ,আবুল হাশেম,শওকত ওসমান প্রমুখদের বন্ধু হিসেবে পেয়ে আরও গতি পায় লেখালেখি। বিভিন্ন স্বনামধন্য পত্রিকায় ছাপা হতে থাকে তার কবিতা। চারপাশে বেশ সাড়া। ছাত্রাবস্থায় তিনি বামপন্থী রাজনীতিতে ঝুঁকে পড়লেও পরিবেশ, সংস্পর্শ মানুষের মনোজগতে প্রভাব ফেলে। ফররুখের বেলায়ও ব্যতিক্রম নয়। অভিজাত মুসলিম পরিবার সৈয়দ বংশে ফররুখের জন্ম। রক্তে মাংসে মিশে আছে ধর্মীয়বোধ। এক বিকেলে আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল খালিক-এর সাথে তার দেখা হয়। তিনি ফুরফুরা দরবার শরীফের আবূ বকর সিদ্দিক (র.) এর বিশিষ্ট খলীফা। তিনি তাকে বুঝালেন স্রষ্টার সৃষ্টির রহস্য। তথ্যউপাত্ত, যুক্তি, দর্শন দিয়ে সহজ সাহসী উচ্চারণে বুঝালেন পথহারা মানুষের মুক্তির জন্য নবী-রাসূল প্রেরণের কারণ। তাওয়াজ্জুর প্রবল প্রভাবে ফররুখ তখন অন্য আবেশে। সমস্ত লোমকূপে জযবার তড়িৎ প্রবাহ। অধ্যাপক সাহেব এবার ফররুখের চোখে চোখ রেখে দুই হাত ঘাড়ের উপরে রেখে বললেন প্রিয় ফররুখ, তুমি কি পারবে না তোমার কাব্য প্রতিভা কাজে লাগিয়ে এই ঘুমন্ত জাতিকে আবার জাগিয়ে তুলতে? আল্লাহর ওলীর পরশে সঙ্গে সঙ্গে একবাক্যে কবি ফররুখ বলে উঠলেন, জি স্যার। আপনার দুআ থাকলে অবশ্যই পারবো ইনশাআল্লাহ! সেই ফররুখ লিখলেন ঐতিহাসিক সাত সাগরের মাঝিসহ আরো কালজয়ী কবিতা। তার বহুল আলোচিত কাব্যগ্রন্থ সিরাজাম মুনীরা উৎসর্গ করলেন আপন পীর ও মুরশীদ প্রফেসর আব্দুল খালিককে। যাঁর জ্যোতির্ময় পরশে নাস্তিকতার নষ্ট কবল থেকে মুক্তি পেয়ে ইতিহাসে মুসলিম রেঁনেসার কবি হিসেবে স্থান পেলেন। ১৯৭৪ সালের ১৯ শে অক্টোবর কবি ফররুখ আহমদ ঢাকায় ইন্তিকাল করেন।

উশাইরাহ অভিযান সংঘটিত হয়

দ্বিতীয় হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে গাযওয়ায়ে উশাইরাহ অভিযান সংঘটিত হয়। কুরাইশের একটি বাণিজ্যিক দল আবূ সুফইয়ানের নেতৃত্বে সিরিয়ায় যাচ্ছিল। গুপ্তচর মারফতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এ সংবাদ পেয়ে আবূ সালামা বিন আবদুল আসাদ মাখযুমী (রা.) কে মদিনার দায়িত্ব দিয়ে ১৫০ বা ২০০ জনের একটি বাহিনী নিয়ে আবূ সুফইয়ানের সেই বাণিজ্যিক দলের পথরোধের জন্য যাত্রা করেন। মুসলমানদের সাদা পতাকার বাহক ছিলেন হামযা বিন আবদুল মুত্তালিব (রা.)। বনূ দিনারের গিরিপথ পেরিয়ে মুসলমানগণ মরুভূমির মধ্য দিয়ে আযহার উপত্যকায় পৌঁছান। তারপর ইয়ামামার ছোট পার্বত্য অঞ্চল পেরিয়ে ইয়ানবুর সমভূমির মধ্য দিয়ে উশাইরায় পৌঁছান। তারা সেখানে জমাদিউল আউয়াল মাসের শেষ সময় এবং জমাদিউস সানীর কয়েকদিন অবস্থান করেন। কিন্তু আবূ সুফইয়ানের বাহিনীর দেখা পাননি।

ঐতিহাসিক মুতা অভিযান সংঘটিত হয়

অষ্টম হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (সা.) জর্ডানের মূতার উদ্দেশ্যে খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য তিন হাজার সৈন্যের একটি দল প্রেরণ করেন। এটিই ছিল খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যুদ্ধাভিযান। যায়িদ বিন হারিসা (রা.) এই যুদ্ধের সেনাপতি মনোনীত হন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, যায়িদ নিহত হলে জাফর বিন আবূ তালিব সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবে, জাফর নিহত হলে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা হবে সেনাপতি। বস্তুত, এই ধরনের সাবধানতা ছিল এটাই প্রথম। খ্রিষ্টান বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লাখ। তাদের সঙ্গে আরবের বিভিন্ন গোত্র থেকে সাহায্যকারীও ছিল প্রায় এক লাখ। প্রথমে মুসলমানরা বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। তুমুল যুদ্ধের এক পর্যায়ে সেনাপতি যায়িদ বিন হারিসা বর্শার আঘাতে শহীদ হন। অতঃপর জাফর বিন আবূ তালিব যুদ্ধের ঝান্ডা হাতে তুলে নেন। এসময় তার ঘোড়া নিহত হয়। অতঃপর মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধাবস্থায় কাফিরের তলোয়ারের আঘাতে তার ডান হাত কর্তিত হয়। তখন তিনি বাম হাতে ঝান্ডা আঁকড়ে ধরেন। এরপর বাম হাত কর্তিত হয়। তখন বগলে ঝান্ডা চেপে ধরেন। অতঃপর তিনি শহীদ হন। তাঁর পরে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা সেনাপতির পতাকা তুলে ধরেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনিও শহীদ হয়ে যান। তখন সকলের পরামর্শক্রমে খালেদ বিন ওয়ালিদ সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বিস্ময়কর সমরকৌশল অবলম্বন করেন। মুসলিম বাহিনীর অভূতপূর্ব শৌর্য-বীর্য, নিখাদ শাহাদাতপ্রিয়তা, সীসাঢালা ঐক্য, বীরতপূর্ণ অতুলনীয় যুদ্ধ নৈপুণ্য এবং সর্বোপরি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে অত্যন্ত অল্প ক্ষতির বিনিময়ে বিশাল বিজয় সাধিত হয়। মুসলিম বাহিনীর মাত্র ১২ জন শহীদ হন। (ইবনু হিশাম)। খ্রিষ্টান রোমক বাহিনীর হতাহতের সঠিক সংখ্যা জানা না গেলেও একা খালিদ বিন ওয়ালিদের নয়টি তরবারী ভেঙ্গেছিল। (বুখারী: ৪২৬৫) তাতে অনুমান করা যায় কত সৈন্য তাদের ক্ষয় হয়েছিল।



ইশতিয়াক চৌধুরী
থানাবাজার, সিলেট

জবাবদাতা: মাওলানা ইমাদ উদ্দিন তালুকদার

প্রশ্ন: নামাযে ইমাম সাহেবের পেছনে কে দাঁড়াবেন বা কাতারের তারতীব (ধারাবাহিকতা) কেমন হবে?

জবাব: ইমামের পিছনে কে দাঁড়াবে বিষয়টি সুস্পষ্ট আকারে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন,

لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ

-তোমাদের মধ্যে যারা অধিক জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান তাঁরা আমার কাছে দাঁড়াবে। এরপর তাদের অনুরূপ যে ক্রম অনুসারে দাঁড়াবে। কাতার করতে আঁকাবাঁকা করবে না, এতে তোমাদের হৃদয়েও অনৈক্যের সৃষ্টি হয়ে পড়বে। সাবধান, বাজরের মত শোরগোল করা থেকে বেঁচে থাকবে। (সুনান তিরমিযী, হাদীস-২২৮)

এ হাদীসে বলা হয়েছে- لِيَلِنِي مِنكُمْ أُولوا الأَحْلامِ والنُّهَى (তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী, তারা যেন আমার কাছাকাছি দাঁড়ায়)। এখানে, أُولوا الأَحْلامِ والنُّهَى বলে প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের বুঝানো উদ্দেশ্য। এ স্তরের লোকদেরকে প্রথম কাতারে দাঁড়াতে বলা হয়েছে। অনেক সময় ইমামের বিশেষ কারণবশত নামাযে কাউকে খলীফা বা নিজের স্থলাভিষিক্ত বানানোর প্রয়োজন পড়ে, যাতে সে মুসল্লীদের নিয়ে অবশিষ্ট নামায সমাপ্ত করতে পারে। তাই প্রথম কাতারে প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানসম্পন্ন লোক দাঁড়ালে খলীফা বানানো সহজ হয়। তাছাড়া যাদের বয়স বেশি এবং জ্ঞানবুদ্ধিতেও অগ্রগামী, অন্যদের তুলনায় তাদের মর্যাদাও বেশি। তাই প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর অগ্রাধিকারও তাদেরই। তারপর বয়স ও জ্ঞানের পর্যায়ক্রম অনুযায়ী এক কাতারের পর আরেক কাতার দাঁড়াতে থাকবেন। সুতরাং বয়স্ক ও আলিমগণ দাঁড়াবেন প্রথম কাতারে। তারপর যারা বয়স্ক কিন্তু আলিম নন, তারা তাদের পেছনে। তারপর দাঁড়াবেন যুবকগণ। তাদের পেছনে শিশুরা। জামাআতে মহিলাগণ শামিল হলে তারা শিশুদের পেছনে দাঁড়াবে। এটা নামাযের গাম্ভীর্যতা রক্ষার উদ্দেশ্যে। অন্যথায় শয়তান ও নফসের সুযোগ নেওয়ার আশঙ্কা থাকে। উল্লেখ্য, বয়স্ক ও জ্ঞানীজনদেরকে সম্মুখে স্থান দেওয়ার এ নীতি নামাযের জন্যই নির্দিষ্ট নয়; বরং নামাযের বাইরেও যে-কোনও মজলিস ও লোকসমাবেশে তাদেরকে সামনে স্থান দেওয়া উচিত। هَيْشَاتِ এর অর্থ ছত্রভঙ্গ অবস্থা, হট্টগোল, উচ্চ আওয়াজ, তর্ক-বিতর্ক। এ হাদীসে মসজিদে বাজারের মত অবস্থা সৃষ্টি করতে নিষেধ করা হয়েছে। ফতোয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ-এ বলা হয়েছে: ইমামের নিকটবর্তী হওয়ার ক্ষেত্রে জ্ঞানী ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের দাঁড়ানো উত্তম; তবে যদি সাধারণ কোনো ব্যক্তি ইমামের নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, তাহলে তাকে সরানোর প্রয়োজন নেই, কারণ যেকোনো অবস্থাতেই নামায সহীহ হয়ে যায়। (খণ্ড: ৩, পৃ: ২৩৬, প্রকাশনায়: دار الإشاعت, করাচি)

বিখ্যাত ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যাহ উল্লেখ আছে,

يَقُومُ الرِّجَالُ أَقْصَى مَا يَلِي الْإِمَامَ ثُمَّ الصِّبْيَانُ

-অর্থাৎ পুরুষরা ইমামের নিকট, তারপর শিশুরা দাঁড়াবে। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যাহ ১/৮৯)

ফাতাওয়ার কিতাব রাদ্দুল মুহতার তথা ফাতাওয়ায়ে শামীতে উল্লেখ করেন,

وَإِنْ سَبَقَ أَحَدٌ إلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ أَكْبَرُ مِنْهُ سِنًّا أَوْ أَهْلُ عِلْمٍ، يَنْبَغِي أَنْ يَتَأَخَّرَ وَيُقَدِّمَهُ تَعْظِيمًا لَهُ، اهـ.

فَهَذَا يُفِيدُ جَوَازَ الْإِيثَارِ بِالْقُرَبِ بِلَا كَرَاهَةٍ.

-কোনো ব্যক্তি যদি প্রথম কাতারে আগে এসে স্থান গ্রহণ করে, অতঃপর তার চেয়ে বয়সে বড় কোনো ব্যক্তি অথবা কোনো আলিম সেখানে প্রবেশ করেন, তাহলে তাকে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ওই ব্যক্তির উচিত পেছনে সরে গিয়ে তাকে নিজের স্থানটি দিয়ে দেওয়া। (আদ-দুররুল মুখতার মায়া রাদ্দিল মুহতার ৫/৫৬৯)

এই প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি সহীহ হাদীস এসছে, যেখানে দেখা যায়, রাসূল ﷺ এর ডান পাশে ইবনু আব্বাস (রা.) বসা আর ডান দিকে কিছু বয়স্ক সাহাবী। রাসূল ﷺ এর অভ্যাস ছিল কোনো কিছু বণ্টনে প্রথমে নিজের ডান দিক থেকে দেয়া। তখন রাসূল ﷺ কাছে একটি পানীয় আসলে রাসূল ﷺ ডান দিকে কম বয়সে সাহাবী আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থাকায় বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবী যারা বাম দিকে আছেন, তাদেরকে আগে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সন্তুষ্ট চেয়ে বলেন,

أَتَأْذَنُ لِي فِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟

-তুমি কি সন্তুষ্ট থাকবে যে, আমি এ বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে পানীয়টি দিয়ে দিই? (সহীহ বুখারী, হাদীস-২৬০৫)

এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানীয় প্রদানের ক্ষেত্রে কম বয়সীর জায়গায় প্রথমে বয়োজ্যেষ্ঠ বা বেশি জ্ঞানীদের দিতে ইচ্ছা পোষণ করেছেন।

আল্লামা ইবনু আবিদীন শামী রাহিমাহুল্লাহ বিষয়ে আরও ব্যাখ্যা করে ফাতাওয়ায় বলেন,

وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا عَارَضَ تِلْكَ الْقُرْبَةَ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا؛ كَاحْتِرَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْأَشْيَاخِ، كَمَا أَفَادَهُ الْفَرْعُ السَّابِقُ وَالْحَدِيثُ، فَإِنَّهُمَا يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنَ الْقِيَامِ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ، وَمِنْ إعْطَاءِ الْإِنَاءِ لِمَنْ لَهُ الْحَقُّ، وَهُوَ مَنْ عَلَى الْيَمِينِ، فَيَكُونُ الْإِيثَارُ بِالْقُرْبَةِ انْتِقَالًا مِنْ قُرْبَةٍ إلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا، وَهُوَ الِاحْتِرَامُ الْمَذْكُورُ. أَمَّا لَوْ آثَرَهُ عَلَى مَكَانِهِ فِي الصَّفِّ

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلْغُلَامِ: «أَتَأْذَنُ لِي فِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟» فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا وَاللَّهِ، فَأَعْطَاهُ الْغُلَامَ، إِذْ لَا رَيْبَ أَنَّ مُقْتَضَى طَلَبِ الْإِذْنِ مَشْرُوعِيَّةُ ذَلِكَ بِلَا كَرَاهَةٍ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ أَفْضَلَ. اهـ.

أَقُولُ: وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إِذَا عَارَضَ تِلْكَ الْقُرْبَةَ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا؛ كَاحْتِرَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْأَشْيَاخِ، كَمَا أَفَادَهُ الْفَرْعُ السَّابِقُ وَالْحَدِيثُ، فَإِنَّهُمَا يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنَ الْقِيَامِ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ، وَمِنْ إِعْطَاءِ الْإِنَاءِ لِمَنْ لَهُ الْحَقُّ، وَهُوَ مَنْ عَلَى الْيَمِينِ، فَيَكُونُ الْإِيثَارُ بِالْقُرْبَةِ انْتِقَالًا مِنْ قُرْبَةٍ إِلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا، وَهُوَ الِاحْتِرَامُ الْمَذْكُورُ.

أَمَّا لَوْ آثَرَهُ عَلَى مَكَانِهِ فِي الصَّفِّ مَثَلًا مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ، يَكُونُ أَعْرَضَ عَنِ الْقُرْبَةِ بِلَا دَاعٍ، وَهُوَ خِلَافُ الْمَطْلُوبِ شَرْعًا.

(الدُّرُّ الْمُخْتَارُ مَعَ رَدِّ الْمُحْتَارِ، ج ٥، ص ٩٦٥، دَارُ الْفِكْرِ، بَيْرُوت)

মাহিয়ান আলী
দক্ষিণ সুরমা, সিলেট

প্রশ্ন: নামাযে টুপি পরা ও পরিপূর্ণ জামা পরা কি জরুরি? টুপি ছাড়া ও হাফ হাতা গেঞ্জি পরিধান করে নামায পড়লে কি নামায পূর্ণতা পায় না?

জবাব: নামাযের অন্যতম একটি আদব হলো, পোশাক-আশাকের ক্ষেত্রে উত্তম ও সুন্দর পোশাক ধারণ করে নামায পড়া। সেই সূত্রে টুপি পরে নামায পড়া নামাযের আদব রক্ষার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يٰبَنِيٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

-হে বনী-আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও, খাও ও পান কর এবং অপব্যয় করো না। তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা আরাফ, আয়াত-৩১)

এজন্য উচিত হলো নামাযে পরিপূর্ণ জামা পরা, টুপি বা পাগড়ি দেওয়া । মাথা খালি রাখা মাকরুহ। এ ব্যাপারে ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে আছে,

وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ حَاسِرًا رَأْسَهُ إِذَا كَانَ يَجِدُ الْعِمَامَةَ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِك تَكَاسُلًا أَوْ تَهَاوُنًا بِالصَّلَاةِ وَلَا بَأْسَ بِهِ إذَا فَعَلَهُ تَذَلُّلًا وَخُشُوعًا بَلْ هُوَ حَسَنٌ. كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

-পাগড়ি বা টুপি থাকা সত্ত্বেও আলসেমি করে বা নামাযকে অবহেলা করে খালি মাথায় নামায আদায় করা মাকরূহ। তবে যদি কেউ বিনয় ও নম্রতা তথা নিজেকে অতি নগন্য হিসেবে (আল্লাহর দরবারে খুশু-খুযূ) প্রকাশের উদ্দেশ্যে খালি মাথায় নামায পড়ে, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই, বরং তা উত্তম। আয-যাখিরাহ কিতাবেও এমনটা আছে। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১/১০৬)

বিখ্যাত ফাতওয়ার কিতাব রাদ্দুল মুহতারে আরও বর্ধিত রয়েছে যে, কেউ যদি টুপিকে তাচ্ছিল্য করে মাথায় না দেয় তখন তা কুফরী হবে-

وَصَلَاتُهُ حَاسِرًا أَيْ كَاشِفًا رَأْسَهُ لِلتَّكَاسُلِ وَلَا بَأْسَ بِهِ لِلتَّذَلُّلِ، وَأَمَّا لِلْإِهَانَةِ بِهَا فَكُفْرٌ وَلَوْ سَقَطَتْ قَلَنْسُوَتُهُ فَإِعَادَتُهَا أَفْضَلُ إلَّا إذَا احْتَاجَتْ لِتَكْوِيرٍ أَوْ عَمَلٍ كَثِيرٍ

-অলসতার কারণে ব্যাক্তির মাথা খোলা রেখে নামায পড়া মাকরূহ।

مَثَلًا مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ، يَكُونُ أَعْرَضَ عَنِ الْقُرْبَةِ بِلَا دَاعٍ، وَهُوَ خِلَافُ الْمَطْلُوبِ شَرْعًا.

-এ মাসআলাটিকে তখনই প্রযোজ্য বলে সীমাবদ্ধ করা উচিত, যখন ওই নেক আমলের বিপরীতে তার চেয়ে অধিক উত্তম কোনো আমল উপস্থিত হয। যেমন, আলিম ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের সম্মান করা।

পূর্বের উল্লিখিত শাখাগত মাসআলা এবং হাদীস থেকেও এ বিষয়টি বোঝা যায়। কারণ উভয়টিই প্রমাণ করে যে আলিম ও বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করা প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর চেয়েও উত্তম এবং পানীয়ের পাত্রটি যার প্রাপ্য অর্থাৎ ডান পাশে যিনি ছিলেন, তাকে দেওয়ার চেয়েও উত্তম। অতএব, এখানে নেক আমলের ক্ষেত্রে অন্যকে নিজের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়ার অর্থ হলো, একটি নেক আমল থেকে সরে তার চেয়ে অধিক উত্তম নেক আমলের দিকে যাওয়া, আর তা হলো উল্লিখিত আলিম ও বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করা। কিন্তু যদি কেউ এমন কোনো ব্যক্তিকে নিজের প্রথম কাতারের স্থান দিয়ে দেয়, যার মধ্যে এমন কোনো বিশেষ মর্যাদা নেই, তাহলে সে কোনো কারণ ছাড়াই একটি নেক আমল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। আর এটি শরীআতসম্মতভাবে কাম্য বিষয়ের পরিপন্থী। -(আদ-দুররুল মুখতার মায়া রাদ্দিল মুহতার ৫/৫৬৯)

তাই নামাযের ক্ষেত্রে ইমামের পিছনে আলিম তথা বিধানাবলি সম্পর্কে জ্ঞাত এবং প্রয়োজন হলে নামায পড়াতে পারেন, এমন ব্যক্তি দাঁড়ানো উত্তম। কাতারের ক্ষেত্রে প্রথমে বয়োজ্যেষ্ঠ যারা রয়েছেন, পরবর্তী কাতারে নাবালকরা দাঁড়ানো উচিৎ।

•

الرِّجَالُ وَالصِّبْيَانُ وَالْخَنَاثَى وَالْإِنَاثُ وَالصَّبِيَّاتُ الْمُرَاهِقَاتُ يَقُومُ الرِّجَالُ أَقْصَى مَا يَلِي الْإِمَامَ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ الْخَنَاثَى ثُمَّ الْإِنَاثُ ثُمَّ الصَّبِيَّاتُ الْمُرَاهِقَاتُ. كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ

وَكُرِهَ لَهُنَّ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ إلَّا لِلْعَجُوزِ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْفَتْوَى الْيَوْمُ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ لِظُهُورِ الْفَسَادِ. كَذَا فِي الْكَافِي وَهُوَ الْمُخْتَارُ. كَذَا فِي التَّبْيِينِ.

ج١ – ص٨٩ – كتاب الفتاوى العالمكيرية الفتاوى الهندية – الفصل الخامس في بيان مقام الإمام والمأموم

•

وَفِي حَاشِيَةِ الْأَشْبَاهِ لِلْحَمَوِيِّ عَنِ الْمُضْمَرَاتِ عَنِ النِّصَابِ: وَإِنْ سَبَقَ أَحَدٌ إِلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ أَكْبَرُ مِنْهُ سِنًّا أَوْ أَهْلُ عِلْمٍ، يَنْبَغِي أَنْ يَتَأَخَّرَ وَيُقَدِّمَهُ تَعْظِيمًا لَهُ، اهـ.

فَهَذَا يُفِيدُ جَوَازَ الْإِيثَارِ بِالْقُرَبِ بِلَا كَرَاهَةٍ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ.

وَقَالَ فِي الْأَشْبَاهِ: لَمْ أَرَهُ لِأَصْحَابِنَا.

وَنَقَلَ الْعَلَّامَةُ الْبَيْرِيُّ فُرُوعًا تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْكَرَاهَةِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الْحَشْرِ: ٩]، وَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَصْغَرُ الْقَوْمِ وَهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، فَقَالَ

(وَصَلَاتُهُ حَاسِرًا) أَيْ كَاشِفًا (رَأْسَهُ لِلتَّكَاسُلِ) وَلَا بَأْسَ بِهِ لِلتَّذَلُّلِ، وَأَمَّا لِلْإِهَانَةِ بِهَا فَكُفْرٌ وَلَوْ سَقَطَتْ قَلَنْسُوَتُهُ فَإِعَادَتُهَا أَفْضَلُ إلَّا إذَا احْتَاجَتْ لِتَكْوِيرٍ أَوْ عَمَلٍ كَثِيرٍ

ج١ – ص٦٤١ – كتاب حاشية ابن عابدين رد المحتار ط الحلبي – فروع مشى المصلي مستقبل القبلة هل تفسد صلاته

•

٨٥٣١ – عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَسَاهُ ثَوْبَيْنِ وَهُوَ غُلَامٌ قَالَ: فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي مُتَوَشِّحًا بِهِ فِي ثَوْبٍ فَقَالَ: «أَلَيْسَ لَكَ ثَوْبَانِ تَلْبَسُهُمَا؟» فَقُلْتُ: بَلَى. فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي أَرْسَلْتُكَ إِلَى وَرَاءِ الدَّارِ لَكُنْتَ لَابِسَهُمَا؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لَهُ أَمِ النَّاسُ؟» قَالَ نَافِعٌ: فَقُلْتُ: بَلِ اللَّهُ

ج١ – ص٣٥٧ – كتاب المصنف عبد الرزاق ت الأعظمي – باب ما يكفي الرجل من الثياب

•

"الجماعة" فحينئذ يصلي بتلك الحالة لأن إخراج الصلاة عن وقتها حرام والجماعة أو واجبة "وإلا" أي وإن لم يخف الفوت "ندب قطعها" وقضية قوله عليه الصلاة والسلام "لا يحل" وجوب القطع للإكمال "و" تكره "الصلاة في ثياب بذلة" بكسر الباء وسكون الذال المعجمة ثوب لا يصان عن الدنس ممتهن وقيل ما لا يذهب به إلى الكبراء ورأى عمر رضي الله عنه رجلا فعل ذلك فقال: أرأيت لو كنت أرسلتك إلى بعض الناس أكنت تمر في ثيابك هذه؟ فقال: لا. فقال عمر رضي الله عنه: الله أحق أن تتزين له "و" تكره وهو "مكشوف الرأس" تكاسلا لترك الوقار "لا للتذليل والتضرع" وقال في التجنيس ويستحب له ذلك قال الجلال السيوطي رحمه الله اختلفوا في الخشوع هل هو من أعمال القلب كالخوف أو من أعمال الجوارح كالسكون أو عبارة عن المجموع قال الرازي الثالث أولى وعن علي رضي الله عنه الخشوع في القلب وعن جماعة من السلف الخشوع في الصلاة السكون فيها وقال البغوي الخشوع قريب من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في البدن والبصر والصوت "و" تكره "بحضرة طعام يميل" طبعه "إليه" لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان" رواه مسلم وما في أبي داود "لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره" محمول على تأخيرها عن وقتها لصريح

ص٣٥٩ – كتاب حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح – فصل في المكروهات

তবে যদি কেউ বিনয় ও নম্রতা তথা নিজেকে অতি নগন্য হিসেবে প্রকাশের উদ্দেশ্যে খালি মাথায় নামায পড়ে, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আর যদি নামাযকে বা এর বিধানকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে খালি মাথায় নামায পড়ে, তবে তা কুফরী। আর নামাযের ভেতর যদি কারো টুপি (মাথা থেকে) পড়ে যায়, তবে তা তুলে মাথায় পুনরায় পরিধান করা উত্তম; তবে তা যদি পেঁচিয়ে পরতে হয় অথবা অনেক বেশি নড়াচড়ার (আমলে কাসীর) প্রয়োজন পড়ে, তবে তা না তোলাই শ্রেয়। (রাদ্দুল মুহতার: ১/৬৪১)

নামাযের আরেকটি আদব হচ্ছে পরিপূর্ণ জামা পরা। এতে নামাযের গাম্ভীর্যতা বজায় থাকে। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তার ছেলে সাহাবী আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছোটবেলায় একদিন এক কাপড়ে নামায পড়ছিলেন। তখন তিনি নিজের সাধ্যমতো ভালো কাপড়ে নামায না পড়ায় শাসিয়ে বলেন, أَلَيْسَ لَكَ ثَوْبَانِ تَلْبَسُهُمَا؟ -তোমার কি পরার মতো দুটি কাপড় নেই?

ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বললাম: হ্যাঁ, আছে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّيْ أَرْسَلْتُكَ إِلَى وَرَاءِ الدَّارِ لَكُنْتَ لَابِسَهُمَا؟

-তুমি বলো তো, আমি যদি তোমাকে বাড়ির বাইরে কোথাও কোনো কাজে পাঠাতাম, তবে কি তুমি সেই দুটি কাপড় পরে যেতে?

তিনি বললেন: হ্যাঁ, যেতাম। তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لَهُ أَمِ النَّاسُ؟

-তাহলে মানুষের জন্য সৌন্দর্য ধারণ করার চেয়ে আল্লাহ তাআলা কি বেশি হকদার নন যে, তুমি তাঁর জন্য সৌন্দর্য ধারণ করবে?

বিশিষ্ট তাবিঈ ইমাম নাফি রাহিমাহুল্লাহ এই প্রশ্নের ব্যাপারে বলেন, ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জবাবে বলেন, অবশ্যই আল্লাহর সামনে নিজেকে সজ্জিত করে উপস্থাপন করা বেশি দায়িত্বপূর্ণ। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস-১৩৯০)

এ জন্য নামাযে কাপড় দ্বারা হাত আবৃত রাখা নিজেকে আল্লাহর সামনে সজ্জিত করে উপস্থাপন করার অন্তর্ভুক্ত। আর কনুই পর্যন্ত জামার হাতা গুটিয়ে নামায আদায় করা মাকরূহ। এ ব্যাপারে ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে রয়েছে,

وَلَوْ صَلَّى رَافِعًا كُمَّيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ كُرِهَ. كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

-আর যদি কেউ জামার হাতা কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে সালাত আদায় করে, তবে তা মাকরূহ হবে। ফাতাওয়া কাজিখান কিতাবেও এরূপই রয়েছে। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১/১০৬)

তাই বিনা উজরে টুপি ছাড়া ও হাফ হাতা গেঞ্জি দিয়ে নামায অনুচিত।

•

وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ حَاسِرًا رَأْسَهُ إذَا كَانَ يَجِدُ الْعِمَامَةَ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ تَكَاسُلًا أَوْ تَهَاوُنًا بِالصَّلَاةِ وَلَا بَأْسَ بِهِ إذَا فَعَلَهُ تَذَلُّلًا وَخُشُوعًا بَلْ هُوَ حَسَنٌ. كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

ج١ – ص١٠٦ – كتاب الفتاوى العالمكيرية الفتاوى الهندية – الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره – المكتبة الشاملة

•

খোরোমা

মেহরিন আক্তার



দুপুরের খাবারের পর ঘুম আসছে?

দুপুরে পেট ভরে খাওয়ার পর অনেকেরই হঠাৎ চোখে ঘুম নেমে আসে। কাজের মাঝে মনোযোগ ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে, শরীরও যেন কিছুটা বিশ্রাম চাইতে থাকে। কিন্তু খাবার খাওয়ার পর এমন ঘুম ঘুম ভাব তৈরি হয় কেন? ডা. আইলিন ক্যান্ডের মতে, খাবার খাওয়ার পর শরীর হজমের প্রক্রিয়ায় যায় এবং এক ধরনের বিশ্রাম অবস্থায় চলে যেতে পারে। অন্ত্র থেকে আসা বিভিন্ন সংকেত, হরমোনের প্রভাব, রক্তে পুষ্টি উপাদানের প্রবাহ এবং প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের সক্রিয়তার মতো বিষয়গুলো খাবারের পর ঘুম ঘুম ভাব তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারে। সাধারণত খাবার খাওয়ার এক থেকে দুই ঘণ্টা পর এই তন্দ্রাভাব বেশি দেখা যায়, বিশেষ করে খাবার পরিমাণে বেশি হলে। তবে শুধু খাবারের পরিমাণই দায়ী নয়। রাতে পর্যাপ্ত ঘুম না হওয়া, অ্যালকোহল, পানিশূন্যতা এবং ঘুমভাব তৈরি করে এমন কিছু ওষুধও এই পরিস্থিতিকে আরো বাড়িয়ে দিতে পারে।



যেভাবে দুপুরের পর সতেজ থাকা যায়

দীর্ঘসময় সতর্ক ও কর্মক্ষম থাকতে খাবারে শস্য, প্রোটিন ও চর্বির পরিমিত সমন্বয় রাখা যেতে পারে। তবে শুধু খাবারের পর ঘুম ঘুম ভাব হলেই সেটিকে হাইপোগ্লাইসেমিয়া বা ডায়াবেটিসের লক্ষণ হিসেবে ধরে নেওয়া উচিত নয়। এ ধরনের বিষয় নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরীক্ষা করা দরকার। বিশেষজ্ঞের মতে, বড় খাবারের পর কিছুটা ক্লান্তি বা তন্দ্রাভাব সাধারণ ঘটনা। কিন্তু প্রতিবার খাবার খাওয়ার পর, খাবারের পরিমাণ যাই হোক না কেন, যদি তীব্র ক্লান্তি দেখা দেয় এবং এর সঙ্গে অতিরিক্ত তৃষ্ণা, অস্বাভাবিক ওজন বাড়া বা কমা, ঝাপসা দেখা কিংবা মনোযোগ ধরে রাখতে না পারার মতো সমস্যা থাকে, তাহলে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা প্রয়োজন। এ ধরনের উপসর্গের পেছনে ইনসুলিন প্রতিরোধ বা টাইপ-২ ডায়াবেটিসের মতো সমস্যা থাকতে পারে। আবার থাইরয়েডের কার্যকারিতায় সমস্যা কিংবা শনাক্ত না হওয়া ঘুমের সমস্যাও খাবারের পর অতিরিক্ত ক্লান্তির কারণ হতে পারে।

সেদ্ধ ডিম সংরক্ষণের উপায়



প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে কিংবা সকালের নাশতায় সেদ্ধ ডিম প্রায় সবার পছন্দ। অনেকে সকালের সময় বাঁচাতে একসঙ্গে বেশ কয়েকটি ডিম সেদ্ধ করে ফ্রিজে রেখে দেন। সাধারণ কাঁচা ডিমের চেয়ে সেদ্ধ ডিম দ্রুত পচনশীল। কারণ, সেদ্ধ করার ফলে ডিমের খোসার ভেতরের প্রাকৃতিক সুরক্ষা কবচ নষ্ট হয়ে যায়। ডিম সেদ্ধ করার পর খোসাসহ কিংবা খোসা ছাড়ানো অবস্থায় ফ্রিজে ৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা তার কম তাপমাত্রায় রাখলে সর্বোচ্চ ৭ দিন ভালো থাকে। তবে ঘরের সাধারণ তাপমাত্রায় সেদ্ধ ডিম ২ ঘণ্টার বেশি ভালো থাকে না।

নিরাপদে সেদ্ধ ডিম সংরক্ষণের উপায় ডিম সেদ্ধ করার ২ ঘণ্টার মধ্যে ঢাকনাযুক্ত এয়ারটাইট পাত্রে ভরে ৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা তার কম তাপমাত্রায় ফ্রিজে রাখুন। তাজা ভাব ও পুষ্টিগুণ বজায় রাখতে খাওয়ার আগমুহূর্ত পর্যন্ত খোসা ছাড়াবেন না।

সেদ্ধ ডিম ডিপ ফ্রিজে রাখবেন না। এতে ডিমের সাদা অংশ বরফ হয়ে শক্ত হয়ে যায়।

ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত ডিম দেখতে বা গন্ধে সব সময় ভিন্ন না-ও হতে পারে। ডিম থেকে দুর্গন্ধ এলে, গায়ে আঠালো ভাব হলে বা রং বদলে গেলে, তা না খেয়ে ফেলে দিন।

বিন্নি চালের পায়েসের রেসিপি



বিন্নি চাল হলো এক ধরনের সুগন্ধি ও আঠালো (স্টিকি) চাল, যা সাধারণত বিশেষ জাতের ধান থেকে তৈরি হয়। এর বৈশিষ্ট্য হলো: এই চাল সাধারণ চালের তুলনায় কিছুটা ছোট ও মোটা হয়। রান্না করলে নরম ও আঠালো হয়। হালকা সুগন্ধ থাকে। পায়েস, পিঠা, ফিরনি, পোলাও বা বিশেষ ধরনের ভাত তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। অনেক জায়গায় বিন্নি ধানের চাল আলাদা ঐতিহ্যবাহী চাল হিসেবে বিক্রি হয়। সিলেটিরা এটিকে বিরইন বা বিরুইন চাউল বলে থাকেন। এ সংখ্যায় আমরা বিন্নি চালের পায়েসের রেসিপি শিখব।

উপকরণ: যা যা লাগবে

- বিন্নি চাল: আধা কাপ, তরল দুধ: দেড় লিটার, খেজুরের গুড়: ১ কাপ (স্বাদমতো দেওয়া ভালো)
- তেজপাতা: ১টি, দারুচিনি: ৩ টুকরা, এলাচ: ৫টি, পেস্তা ও কাঠবাদামকুচি বা কিশমিশ: পছন্দমতো, লবণ: ১ চিমটি

প্রস্তুত প্রণালি

বিন্নি চাল ভালো করে ধুয়ে সারা রাত পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। সকালে পানি ঝরিয়ে হাত দিয়ে হালকা ভেঙে নিন। তারপর পাত্রে দুধ, তেজপাতা আর দারুচিনি দিয়ে জ্বাল দিতে থাকুন। গুড় পরিমাণমতো পানিতে জ্বাল দিয়ে গলিয়ে নিতে হবে। আগে থেকে এলাচ ছেঁচে ৩ কাপ গরম পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। দুধ ফুটে অল্প ঘন হয়ে এলে ভেজানো চাল ও লবণ দিয়ে রান্না করতে হবে। মাঝেমধ্যেই নেড়ে দিন, যাতে ডেগ/প্যানের তলায় লেগে না যায়। চাল সেদ্ধ হয়ে পায়েস ঘন হয়ে এলে চুলা থেকে নামিয়ে একটু ঠান্ডা করে নিতে হবে। এবার হালকা গরম গলানো গুড় ও এলাচ পানি দিয়ে আবারও জ্বালে বসিয়ে ঘন ঘন নেড়ে পায়েস থকথকে করতে হবে। হয়ে এলে কিশমিশ দিয়ে পরিবেশন পাত্রে ঢেলে ওপরে বাদামকুচি ছড়িয়ে দিন। যাঁরা নারকেল খেতে পছন্দ করেন, তাঁরা গুড়ের সঙ্গে পছন্দমতো কোরানো নারকেল মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে তারপর চালের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে পারেন। ঠান্ডা বা গরম দুভাবেই এই পায়েস স্বাদে অনন্য।

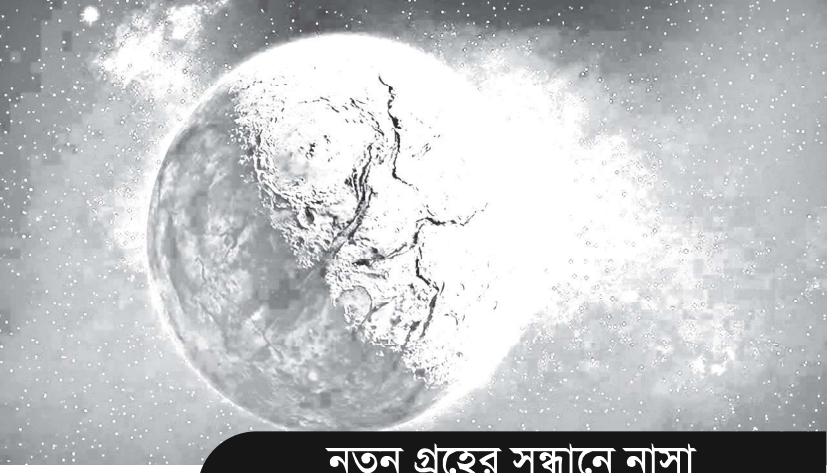

নতুন গ্রহের সন্ধানে নাসা

মহাশূন্যের অন্ধকার ভেদ করে ডার্ক এনার্জি, ডার্ক ম্যাটার এবং সৌরজগতের বাইরের নতুন গ্রহের সন্ধানে এবার মহাকাশে পাড়ি জমিয়েছে নাসার সর্বাধুনিক 'ন্যান্সি গ্রেস রোমান স্পেস টেলিস্কোপ'। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় অবস্থিত কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে স্পেসএক্সের ফ্যালকন হেভি রকেটে চড়ে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে এই মহাকাশযানটি। নাসার প্রথম প্রধান জ্যোতির্বিজ্ঞানীর সম্মানে নামকরণ করা এই টেলিস্কোপ পৃথিবী থেকে প্রায় ১৬ লাখ কিলোমিটার দূরে—জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের প্রতিবেশী এলাকাতেই অবস্থান নেবে।

কিন্তু কীভাবে কাজ করবে এই রোমান টেলিস্কোপ?

নাসার তথ্যমতে, এর মূল হাতিয়ার দুটি অত্যাধুনিক যন্ত্র। প্রথমটি হলো 'ওয়াইড ফিল্ড ইনস্ট্রুমেন্ট' (WFI)। এটি মূলত একটি ৩০০ মেগাপিক্সেলের বিশাল ইনফ্রারেড ক্যামেরা। এর ১৮টি সেন্সর আলোর কণা ধারণ করে মহাকাশের অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্যানোরামিক ছবি তৈরি করবে। দ্বিতীয়টি হলো 'করোনাগ্রাফ ইনস্ট্রুমেন্ট' (CGI)। এর প্রধান কাজ হলো উজ্জ্বল নক্ষত্রের কাছাকাছি থাকা অস্পষ্ট গ্রহগুলোর (এক্সোপ্লানেট) সরাসরি ছবি তোলা এবং সেগুলোর বায়ুমণ্ডল বিশ্লেষণ করা।

রোমান টেলিস্কোপের কাজের গতি হাবল টেলিস্কোপের চেয়ে হাজার গুণ বেশি! প্রাথমিক আয়ুষ্কাল ৫ বছর হলেও, এটি ১০ বছর পর্যন্ত টিকবে বলে আশা বিজ্ঞানীদের। এই দীর্ঘ সময়ে এটি কোটি কোটি গ্যালাক্সি স্ক্যান করবে। এর বিশাল তথ্যভাণ্ডার কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের মহাকর্ষীয় সূত্রগুলোও নতুন করে পরীক্ষা করবেন। নাসার বিজ্ঞানীদের মতে, মহাবিশ্বকে এমন নিখুঁত চোখে আগে কখনো দেখা যায়নি; এটি সৌরজগতের বাইরে প্রাণের অস্তিত্ব খোঁজার ভিত্তি তৈরি করে মানবজাতিকে এক নতুন যুগে প্রবেশ করাবে। এর মাধ্যমে মহাবিশ্বের সবচেয়ে গভীর রহস্যগুলো উন্মোচনের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল মানবজাতি।

এক গ্যালাক্সিতে তিন ব্ল্যাকহোল!

মহাবিশ্বের গভীরে থাকা একটি গ্যালাক্সিতে একসঙ্গে তিনটি সক্রিয় সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল ফিজিকসের গবেষকেরা মহাজাগতিক এই গ্যালাক্সিটির নাম দিয়েছেন 'জে০১৪৮-৪২১৪'। গ্যালাক্সিটিতে থাকা তিনটি ব্ল্যাকহোলই সক্রিয়। অর্থাৎ তিনটিই নিজেদের চারপাশের অ্যাক্রিশন ডিস্ক থেকে পদার্থ প্রবল মহাকর্ষীয় আকর্ষণে টেনে নিচ্ছে। পৃথিবী থেকে প্রায় ১ হাজার ২৫০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এই গ্যালাক্সিটি। এর কেন্দ্রীয় অঞ্চলে দুটি ব্ল্যাকহোল খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে। তাদের পারস্পরিক দূরত্ব প্রায় ৬২০ আলোকবর্ষ। আর তৃতীয় ব্ল্যাকহোলটি গ্যালাক্সির বাইরের দিকে, কেন্দ্র থেকে প্রায় ৫ হাজার ৫০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করছে। গবেষণায় তিনটি ব্ল্যাকহোলের ভরও পরিমাপ করা হয়েছে। সবচেয়ে বড়টির ভর সূর্যের চেয়ে প্রায় ৮ কোটি গুণ বেশি। অন্য দুটি ব্ল্যাকহোলের ভর যথাক্রমে সূর্যের প্রায় ৬ লাখ ও ২০ লাখ গুণ। ব্ল্যাকহোলের প্রবল মহাকর্ষীয় টানে হাইড্রোজেন পরমাণু অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঘুরতে থাকে। আয়োনাইজড হাইড্রোজেনের এই গতিবিধি আলোতে বিশেষ ধরনের সংকেত তৈরি করে। সেই সংকেত বিশ্লেষণ করেই ব্ল্যাকহোলগুলোর অবস্থান শনাক্ত করা হয়েছে।

কেন্দ্রের কাছাকাছি থাকা দুটি ব্ল্যাকহোলের কারণে সেখানকার বর্ণালি জটিল হয়ে ওঠে। ফলে পৃথক দুটি উৎস শনাক্ত করতে বিজ্ঞানীরা স্পেকট্রো-অ্যাস্ট্রোমেট্রি পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এ পদ্ধতিতে গ্যালাক্সিজুড়ে নির্গত আলোর সূক্ষ্ম স্থানিক পরিবর্তন বিশ্লেষণ করে উৎসগুলোর অবস্থান নির্ধারণ করা যায়। এ কাজে জেমস ওয়েব মহাকাশ দূরবীক্ষণযন্ত্রের এনআইআরস্পেক-আইএফএস যন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। দূরবর্তী মহাবিশ্বের একটি গ্যালাক্সিতে একসঙ্গে তিনটি সক্রিয় ব্ল্যাকহোল শনাক্ত করার ঘটনা এবারই প্রথম।

পরওয়ানা ডেস্ক



সৌর প্যানেল থেকে কীভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়?

সৌর প্যানেলের কাজ হলো সূর্যের আলোর শক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা। এ জন্য প্যানেলে রাখা হয় অনেক ফটো ভোল্টাইক সেল। ফটো ভোল্টাইকের অর্থ হলো সূর্যরশ্মি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের এক বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা। এরা সূর্যরশ্মির ফোটন ব্যবহার করে সিলিকন সেলের ইলেকট্রনগুলোকে আলোড়িত করে। এর ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। কিন্তু সেই বিদ্যুৎ যদি রাতে ব্যবহার করতে চাই, তাহলে তা সঞ্চয় করে রাখার একটি ব্যবস্থা দরকার। ব্যাটারির সাহায্যে সেটা করা হয়। যেমন আইপিএসের ব্যাটারি আমরা বাসার বিদ্যুৎ দিয়ে চার্জ করে রাখি, হঠাৎ বিদ্যুৎ কোনো কারণে চলে গেলে আইপিএসে সঞ্চিত বিদ্যুৎ ব্যবহার করি। সৌরবিদ্যুতের ক্ষেত্রেও প্রায় সে রকম ব্যবস্থাই করা হয়। সূর্যের আলো থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ দিয়ে সারা দিন ব্যাটারি চার্জ করে রাখা হয়। সেই বিদ্যুৎ প্রয়োজনে দিনের বেলায়ও সরাসরি ব্যবহার করা যায়। যেমন সৌরবিদ্যুৎ সরাসরি ব্যবহার করে দিনের বেলা ফসলের খেতে পানিসেচের ব্যবস্থা করা হয়। আবার রাতে বাসায় বাতি জ্বালানো, ফ্যান, রেডিও-টিভি চালানো যায়। এখন আমাদের অনেক গ্রামে একটি ছোটখাটো সোলার প্যানেল ব্যবহার করে তিন ঘরে তিনটি বাতি ও একটি টিভি দেখা যায়।

চাঁদ থেকে কি বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব?

সূর্যরশ্মি সরাসরি পৃথিবীতে আসে এজন্য সূর্যের আলো থেকে আমরা সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারি। কিন্তু চাঁদের আসলে নিজস্ব কোনো আলো নেই। চাঁদের আলো সূর্যালোকের প্রতিফলিত রশ্মি। এর তীব্রতা খুবই কম। তাই শক্তির পরিমাণও অত্যন্ত কম। তাই লাভজনকভাবে এ শক্তি কাজে লাগানো সম্ভব নয়, যা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। কিন্তু চাঁদে সৌর প্যানেল বসিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। সেই বিদ্যুৎ যদি বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের রূপে পৃথিবীতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে একঅর্থে পরোক্ষ উপায়ে চাঁদের আলো থেকে আমরা বিদ্যুৎ পেতে পারি। অবশ্য এটা খুব জটিল প্রযুক্তির ব্যয়বহুল প্রকল্প হবে।

অভ্যন্তরীণ

জাতিসংঘের অধিবেশনের প্রথমবারের মতো অংশ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রথমবারের মতো অংশ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। জাতিসংঘ সদরদপ্তরের নর্থ ডেলিগেটস লাউঞ্জে বিশ্বনেতা ও তাঁদের স্ত্রীদের সম্মানে জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস আয়োজিত স্বাগত প্রাতরাশে প্রধানমন্ত্রী অংশ নেন। পরে স্থানীয় সময় সকাল ৯টায় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সাধারণ পরিষদ হলে অনুষ্ঠিত ৮১তম অধিবেশনের উদ্বোধনী পর্বে যোগ দেন। অধিবেশনে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে কয়েকটি দেশ ও সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এর মধ্যে রয়েছেন- তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে, হাইতির প্রধানমন্ত্রী অ্যালিক্স দিদিয়ের ফিলজ-এম, মালদ্বীপের ভাইস প্রেসিডেন্ট হুসাইন মোহাম্মদ লাতিফ ও বিশ্বব্যাংক গ্রুপের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা। এসব বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাশপাশি ব্যবসাবাণিজ্য, আঞ্চলিক সহযোগিতা, রোহিঙ্গাসংকটসহ বৈশ্বিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। এ ছাড়া মিয়ানমার বিষয়ক জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ দূত জুলি বিশপ, ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট অ্যান্তোনিও কস্তা, জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনার বারহাম সালেহ এবং মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্কের সঙ্গে পৃথক সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের বার্তা তুলে ধরেন বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন। যুক্তরাষ্ট্রের হায়াত গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল নিউইয়র্ক হোটেলের লবিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

সরকারি বেতনে নতুন স্কেল অনুমোদন

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন জাতীয় বেতন স্কেল ২০২৬ অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা। সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। নতুন কাঠামোয় বিদ্যমান ২০টি বেতন গ্রেড বহাল রেখে মূল বেতন পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে সর্বনিম্ন মূল বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে ২০ হাজার এবং সর্বোচ্চ ১ লাখ ৫৬ হাজার টাকা। নতুন বেতন স্কেলে অতীতের চেয়ে দুটি নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর একটি হলো পেনশনভোগীদের শতভাগ পেনশন বৃদ্ধি করা হয়েছে। একই সঙ্গে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী যাদের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সন্তান রয়েছে তাদের মাসিক ৩ হাজার টাকা ভাতার আওতায় আনা হয়েছে। জাতীয় বেতন কমিশন-২০২৫ এবং সংশ্লিষ্ট বেতন কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর সচিব কমিটি সুপারিশ প্রণয়ন করে। সেই সুপারিশের ভিত্তিতে দেশের আর্থিক সক্ষমতা, সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, মূল্যস্ফীতি, জীবনযাত্রার ব্যয়, সরকারি কর্মচারীদের জীবনমান এবং যৌক্তিক বেতন কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় নিয়ে নতুন বেতন স্কেল অনুমোদন করা হয়েছে। বাজারে এর কী ধরনের প্রভাব পড়বে তাও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। নতুন কাঠামোয় সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ গ্রেডের বেতনের অনুপাতও কিছুটা কমানো হয়েছে। বর্তমানে এ অনুপাত ১:৯.৯৪ থেকে কমিয়ে ১:৭.৮ করা হয়েছে। ফলে সর্বনিম্ন গ্রেডের মূল বেতন ১৪২ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ গ্রেডের নির্ধারিত বেতন ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে । অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও মূল্যস্ফীতির ওপর চাপ বিবেচনায় নিয়ে সরকার একসঙ্গে পুরো বেতন স্কেল বাস্তবায়ন না করে ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নতুন বেতন স্কেলে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে। সামরিক ও অসামরিক উভয় ক্ষেত্রে এটি একসঙ্গে বাস্তবায়নের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় আপাতত বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

দেশে ডেঙ্গু আতঙ্ক বাড়ছে

প্রতিদিনই বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। দেশের সব জেলায় ছড়িয়ে পড়ছে ডেঙ্গু। বিশেষ করে বড় বড় শহরগুলোতে এ অবস্থা ভয়ংকর। রোগীদের চিকিৎসা দিতে রীতিমতো হিমশিম খেয়ে হচ্ছে সরকারি হাসপাতালগুলোকে। চিকিৎসকরা বলছেন, স্বাস্থ্য বিভাগের একার পক্ষে ডেঙ্গুর বিস্তার রোধ সম্ভব নয়। সবাইকে নিজ বাড়ি, নিজ এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, যাতে এডিস মশা বিস্তার লাভ করতে না পারে। একদিকে হামের রোগীর চাপ, অন্যদিকে ডেঙ্গুর ঊর্ধ্বমুখী সংক্রমণ- ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এর মধ্যে সেপ্টেম্বর মাসে ডেঙ্গুর প্রকোপ নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে। চলতি মাসের ২৪ দিনেই ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ১৩ জন। এ সময়ে চিকিৎসা নিয়েছেন ১ হাজার ২৫১ জন। নতুন করে ভর্তি হয়েছেন ৫৯ জন। বিভাগীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত বরিশাল বিভাগের সরকারি হাসপাতালগুলোতে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ১০ হাজার ২০১ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মারা গেছেন ১৫ জন। **যশোরে মৃত ২, আক্রান্ত ১ হাজার ২৮৮।** কুমিল্লার দাউদকান্দিতে প্রতিদিন ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। ২৪ ঘণ্টায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও বেসরকারি পর্যায়ে ২৪৫ জনের ডেঙ্গু পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩৭ জনের ডেঙ্গু শনাক্ত হয়েছে। চলতি বছরের ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ উপজেলায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন ১ হাজার ১০৩ জন।

নতুন সংকট দেখা দিয়েছে জ্বালানি আমদানিতে

মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের জ্বালানি আমদানিনির্ভর দেশগুলো জ্বালানি আমদানির ক্ষেত্রে নতুন করে সংকটে পড়েছে। সৌদি আরবের যে তেল আমদানি করতে বাংলাদেশের আগে ১৫-১৬ দিন সময় লাগত, জাহাজ চলাচলে শঙ্কা ও সৌদি আরবের ইস্ট ওয়েস্ট পাইপলাইন সাময়িক বন্ধের কারণে এখন তা আনতে ৫০ দিন সময় লাগবে। এতে একদিকে যেমন দেশের জ্বালানি তেল আমদানির ব্যয় প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে, একই সঙ্গে বাড়বে পণ্য আমদানির সময়। দীর্ঘ সময় ধরে জ্বালানি আমদানির কারণে পণ্য প্রাপ্তিতে ঝুঁকি তৈরি হওয়ারও শঙ্কা আছে। এ পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির মূল্য লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে বৈদেশিক মুদ্রার ওপর চাপ বাড়ায় তা সরাসরি দেশের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি দীর্ঘস্থায়ী চ্যালেঞ্জ। এজন্য বিকল্প উৎস বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো থেকে জ্বালানির উৎস খুঁজে বের করতে হবে। মধ্যপ্রাচ্যে সংকটের কারণে হরমুজ প্রণালিতে পণ্যবাহী জাহাজ চলাচল বিঘ্নিত হওয়ার পর বৈশ্বিক জ্বালানি আমদানি-রপ্তানির গুরুত্বপূর্ণ আরেক প্রণালি বাব আল-মান্দেব দিয়েও জাহাজ চলাচলে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। ইয়েমেনের লোহিত সাগর উপকূলে ইরান-সমর্থিত হুতিদের নিয়ন্ত্রণ বাড়ায় এ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রেন্ট

ক্রুড ওয়েলের দাম বেড়ে ব্যারেলপ্রতি ১০৪ দশমিক ৬১ ডলারে ঠেকেছে। অথচ এক মাস আগেও ছিল ৮৭ দশমিক ০৭ ডলার।

পরিবেশমন্ত্রী ও নেপালের রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টুর সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত ঘনশ্যাম ভান্ডারী সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘদিনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। পরিবেশ সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বন ও প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং আঞ্চলিক পরিবেশগত সহযোগিতা আরও জোরদার নিয়েও মতবিনিময় করেন তারা। এ সময় নেপালে সাম্প্রতিক ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণহানিতে পরিবেশমন্ত্রী গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। শোকাবহ সময়ে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণ নেপালের সরকার ও জনগণের পাশে রয়েছে উল্লেখ করে তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী মানবিক সহায়তা ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রস্তুতির কথা জানান। নেপালের দুর্ঘটনার পর দেশটির জনগণের প্রতি সংহতি প্রকাশ এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান রাষ্ট্রদূত। সংকটের সময়ে বাংলাদেশের এই সহমর্মিতা দুই দেশের জনগণের গভীর বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক আস্থার প্রতিফলন বলেও উল্লেখ করেন তিনি। বৈঠকে পরিবেশ ও জলবায়ু সহযোগিতার পাশাপাশি বাণিজ্য, যোগাযোগ, পর্যটন, শিক্ষা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে দুই দেশের ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা নিয়েও আলোচনা হয়। আঞ্চলিক যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব শক্তিশালী হলে উভয় দেশের জনগণের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে মত দেন তারা।

এআই ব্যবহারে শিশুদের সক্ষম করার তাগিদ শিক্ষামন্ত্রীর

শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, শিশুদেরকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারে (এআই) সক্ষম করে গড়ে তুলতে হলে, তাদের শিখন দক্ষতা আরো বৃদ্ধি করতে হবে। ফ্রান্সের প্যারিসে ইউনেস্কো আয়োজিত 'ডিজিটাল লার্নিং উইক ২০২৬' এর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে শিক্ষা (Education in the age of AI) শীর্ষক সেশনে বক্তৃতাকালে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের শিশুদের ভিত্তিমূলক শিক্ষা বা বুনিয়াদি শিখনে (Foundational Learning) দুর্বলতা রয়েছে। তাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থেকে নিরাপদে সর্বোচ্চ সুবিধা গ্রহণ করতে হলে তাদের পড়া, যুক্তি ও যাচাই করার দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করতে হবে। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালুর আগেই পরীক্ষামূলক প্রকল্প, ক্রয়, মূল্যায়ন ও সংশোধন প্রক্রিয়ায় শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করতে হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের অনেক সময় বাঁচায়। তাই বলে সব ক্ষেত্রেই এটা ব্যবহার করার সুযোগ নেই। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সারাবিশ্বেই ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং জনপ্রিয়তা লাভ করছে। কিন্তু, ব্যবহারকারীর সংখ্যা, পরীক্ষামূলক প্রকল্পের সংখ্যা বা সম্পৃক্ততা দেখে এর সফলতা বিচার করা ঠিক হবে না। বাংলাদেশকে এআই এর মূল্যায়ন করতে হবে শেখার ফলাফল, শিক্ষকের কাজের চাপ, সমতা, নিরাপত্তা ও ব্যয়-সাশ্রয়ের ভিত্তিতে। পাশাপাশি, শিক্ষকরা কীভাবে এবং কতটুকু এর সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেন সেটাও বিবেচনা করতে হবে।

আন্তর্জাতিক

হুথিদের ভয়াবহ হামলা সৌদির বিমানঘাঁটিতে

সৌদি আরবের দক্ষিণাঞ্চলের খামিস মুশাইত শহরে কিং খালিদ বিমানঘাঁটিতে বড় ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে বলে দাবি করেছে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা। হুতির সামরিক মুখপাত্র এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বিমানঘাঁটির হ্যাঙ্গার, রাডার, রানওয়ে ও অস্ত্রভান্ডার লক্ষ্য করে ডজন ডজন ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে। এতে ঘাঁটিতে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করা হলেও তাৎক্ষণিকভাবে এ বিষয়ে কিছু জানায়নি সৌদি কর্তৃপক্ষ। ইয়েমেনে সৌদি জোটের তীব্র বিমান হামলার জবাবে এ পালটা অভিযান চালিয়েছে বলে দাবি করছে হুতি বিদ্রোহীরা। পাঁচ দিন ধরে সৌদির যুদ্ধবিমানগুলো ইয়েমেনের বিভিন্ন প্রদেশে ৩ শতাধিক বিমান হামলা চালিয়েছে। এদিকে সৌদির সিভিল ডিফেন্স খামিস মুশাইত এলাকায় সাময়িক সতর্কতা জারি করলেও পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে। হুতিরা বলছে, সৌদি আরব যতদিন ইয়েমেনে সামরিক অভিযান চালিয়ে যাবে, ততদিন সৌদির ভিতরে হামলা অব্যাহত রাখবে তারা। একই সঙ্গে তারা সতর্ক করেছে, নতুন কোনো হামলা চালানো হলে জবাব কঠোরভাবে দেওয়া হবে। হুতিরা সৌদির জ্বালানি কেন্দ্রগুলো লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে। লোহিত সাগরের দক্ষিণাংশের আরও কয়েকটি কৌশলগত দ্বীপ দখল করে নিয়েছে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা। এতে বিশ্বের অন্যতম প্রধান আন্তর্জাতিক নৌপথে নিজেদের অবস্থান ও নিয়ন্ত্রণ আরও শক্তিশালী করল ইরান সমর্থিত গোষ্ঠীটি।

ইয়েমেন-যুক্তরাষ্ট্রের পালটাপালটি হুমকি

সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে ইয়েমেনের হুতিদের হামলার পর ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র নতুন করে পালটাপলটি হুমকি দিয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরান যদি কোনো চুক্তি না করে তবে তারা অর্থনৈতিকভাবে ব্যর্থ হবে অথবা এর নেতৃত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মুখোমুখি হতে পারে। অপরদিকে ইরানের সামরিক বাহিনী বলেছে, নতুন করে কোনো হামলা চালানো হলে তারা এর কঠোর জবাব দেবে। এই সংঘাতের কারণে বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট গভীর হয়েছে, ইরানের অর্থনীতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর এটি ছড়িয়ে নতুন আঞ্চলিক উত্তেজনার দিকে গড়ালেও কোনো পক্ষই ছাড় দেওয়ার কোনো লক্ষণ দেখাচ্ছে না। ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার মধ্য দিয়ে ইরান যুদ্ধ শুরু হয়। তারপর থেকে সাত মাস ধরে চলা এই যুদ্ধে ট্রাম্প বারবার বড় ধরনের সামরিক হামলার হুমকি দিয়ে এলেও সেগুলো বাস্তবায়ন করেননি। ইরানের সামরিক বাহিনীর কেন্দ্রীয় কমান্ড বলেছে, নতুন করে কোনো হামলা চালানো হলে তা মার্কিন ঘাঁটি ও স্বার্থের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপের সূত্রপাত ঘটাবে আর ওয়াশিংটনের আঞ্চলিক মিত্রদেরও এই সংঘাতের পক্ষভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হবে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নতুন করে যে কোনো আলোচনা শুরু করার জন্য ওয়াশিংটনকে সাতটি শর্ত দিয়েছে ইরান। ইরানের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সচিব মোহসেন রেজায়ি একথা জানিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র ফের আক্রমণ চালালে ইরানের নতুন সামরিক সক্ষমতা দেখে বিশ্ব অবাক হয়ে যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে দেশটির ইসলামিক বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি)।



রানি যুবাইদার কেনা মাটির প্রাসাদ

জিয়াউদ্দীন কামাল

খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ। দিল্লিতে তখন সুলতান জালালউদ্দীন খলজির শাসনকাল। দিল্লির বাজার প্রতিদিনের ন্যায় আজও জমজমাট। দুপুরের চড়া রোদে বাজারের দিক থেকে ভাজা জিলিপি আর গরম পরোটার মচমচে সুবাস ভেসে আসছে। সুদূর পারস্য আর খোরাসান থেকে আসা বণিকেরা রঙিন রেশমি কাপড়ের থান মেলে ধরে হাঁকডাক ছাড়ছে। এক পাশে তুর্কি ঘোড়া আর কাশ্মিরী শাল নিয়ে জোর দরদাম চলছে। চেনা কোলাহল, চেনা ধুলোবালি আর মানুষের হাসিমুখের ভিড়ে পুরো বাজার যেন এক জীবন্ত উৎসব। ঠিক তখনই শস্য বাজারের বড় নিমগাছটার তলায় ডুগডুগির একটা চেনা আওয়াজ উঠল–ডুগ-ডুগ-ডুগ! বাজারের কুলি, তরুণ সওদাগর, আর জিলিপি হাতে ছুটে বেড়ানো একদল শিশু এক নিমেষে দৌড়ে গেল সেদিকে। সেখানে একটা ভাঙা কাঠের বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো গল্পকার ইসমাইল। তার পরনে তালি দেওয়া লম্বা আলখাল্লা, সাদা দাড়িতে পানের লাল ছোপ, আর চোখে এক অদ্ভুত কৌতুক। ডুগডুগিটা ঝুলিতে পুরে ইসমাইল দুই হাত তুলে নাটকীয় ভঙ্গিতে চিৎকার করে উঠল, আসো দিল্লির দিলওয়ালারা! আজ তোমাদের শোনাবো খোরাসানের সেই বোকা জিন আর এক চতুর কাঠুরের কিস্‌সা! যে জিন এক কলসি মোহরের লোভে নিজের দাড়ি নিজেই কামিয়ে ফেলেছিল! চারপাশে বসা শ্রোতারা হো হো করে হেসে উঠল। সামনের সারিতে বসা এক মসলা ব্যবসায়ী তার পাশে বসা কোতোয়ালের (পুলিশ) কাঁধে চাপড় মেরে বলল, শুনলেন কোতোয়াল সাহেব? আপনার ওই খামখেয়ালী শালাবাবুর মতোই জিনের কাণ্ড! কোতোয়াল সাহেবও রাগ না করে গোঁফে তা দিয়ে হা হা করে হাসিতে যোগ দিলেন। ইসমাইল তার খসখসে কিন্তু জাদুকরী গলায় হাত-পা নেড়ে গল্প বলতে শুরু করল। কিন্তু আজ অন্যদিনের মতো হলো না। অন্যসময় যেখানে সবাই মনোযোগ দিয়ে গল্প শুনতো আজ সেখানে ইসমাইলের গল্পের মাঝপথে দর্শকের কাতারে থাকা এক লোক উঠে দাড়াল। সে ইসমাইলকে থামাল আর বলল, কীসব বানোয়াট গল্প বলছ? এসব গল্প কি আর আজকাল চলে? গল্পের মাঝখানে বাধা দেওয়ায় ক্ষেপে গেলেন ইসমাইল। বললেন, ওহে মহাপুরুষ! তবে তুমিই বলো আজকাল কী গল্প চলে? অন্য দর্শকরাও সেই লোককে নানা কথা বলতে লাগলো, আরে তোমার সমস্যা কী?/আরে লোকটা কে?/অসভ্য লোক/কোনো আদব-লেহাজ নেই/ও এতো ভালো গল্প পারলে নিজে বলে না কেন? ইত্যাদি...ইত্যাদি।

হঠাৎ সবাইকে থামিয়ে লোকটা উঠে দাঁড়াল। গায়ের চাঁদর একবার খুলে আবার ভালো করে জড়িয়ে নিল গায়ে। ইসমাইল গিয়ে দর্শকের কাতারে বসে গেল। তার চোখে-মুখেও কৌতুহল। লোকটা প্রথমেই বলল, আমি কোনো ঔপন্যাসিক কিংবা লেখক নই। আমি বানিয়ে গল্পও বলি না। থামল সে। চারকিে তাকালো একবার। বাজারের কোলাহল তখনও থামেনি, কিন্তু তার সামনে বসা মানুষগুলোর চোখে কৌতূহল। এরপর শুরু করল তার কথা, আমি কেবল এক মুসাফির। তোমরা গল্প শুনতে চেয়েছ। কিন্তু আমার গল্পগুলো রাজা-বাদশাহরে ইতিহাসের মতো নয়। পৃথিবীর পথে পথে ঘুরতে গিয়ে কত মানুষকে খেছি, কত অদ্ভুত ঘটনা চোখের সামনে ঘটতে দেখেছি–তার কতটুকুই বা মনে আছে! একটু থেমে সে মৃদু হাসল! তবে আজ তোমাদের এমন একজন মানুষের কথা বলব, যাকে সবাই পাগল বলত। অথচ কখনো কখনো তার একটি কথাই রাজদরবারের সমস্ত জাঁকজমককে ম্লান করে দিত। ভিড় আরও নীরব হয়ে গেল। লোকটি বলতে লাগলো, "ঘটনাটি বহু বছর আগের। স্থান–বাগদাদ। সেই সময় বাগদাদ ছিল জ্ঞান, বাণিজ্য আর রাজকীয় জাঁকজমকের এক বিশাল নগরী। আর সেই নগরীতেই থাকতেন এক অদ্ভুত মানুষ–নাম

তার বাহলুল। লোকেরা তাকে পাগল বলত। কেউ তাকে নিয়ে হাসত, কেউ আবার তার কাছ থেকে দূরে থাকত। কিন্তু তার কথায় এমন এক প্রজ্ঞা ছিল, যা অনেক সময় জ্ঞানীদেরও থমকে দিত। সেই সময়ের একজন প্রতাপশালী আব্বাসী খলীফা ছিলেন। যার নাম হারুন-উর-রশীদ। তার দরবার ছিল জ্ঞানী, কবি ও বিদ্বানদের সমাগমে মুখর। বাহলুলের সঙ্গেও খলীফার নানা সময়ে সাক্ষাৎ হতো। আজ তেমনই একটি প্রচলিত কাহিনি বলব: একদিন খলীফা হারুন-উর-রশীদের স্ত্রী মহিয়সী রানি যুবাইদা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন, বাহলুল পাগল রাস্তার পাশে ধুলোবালি নিয়ে খেলছেন এবং মাটিতে লাঠি দিয়ে ছোট ছোট ঘরের মতো নকশা আঁকছেন। যুবাইদা কৌতূহলী হয়ে বাহলুলকে জিজ্ঞেস করলেন, বাহলুল, তুমি মাটিতে ওগুলো কী বানাচ্ছ? বাহলুল অত্যন্ত গম্ভীর মুখে উত্তর দিলেন, আমি বেহেশতের প্রাসাদ তৈরি করছি। রানি যুবাইদা মুচকি হেসে রসিকতা করে বললেন, আচ্ছা, তোমার এই প্রাসাদ কি বিক্রি করবে? দাম কত? বাহলুল বললেন, হ্যাঁ, বিক্রি করব। দাম মাত্র একটি স্বর্ণমুদ্রা। রানি যুবাইদা বাহলুলকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে এবং তঁর মন রাখার জন্য তৎক্ষণাৎ তার এক দাসীকে ডেকে একটি স্বর্ণমুদ্রা বাহলুলের হাতে দিতে বললেন। বাহলুল মুদ্রাটি নিয়ে রানিকে বললেন, ঠিক আছে, বেহেশতে এই প্রাসাদটি আপনার নামে বরাদ্দ করা হলো। এরপর বাহলুল সেই মুদ্রাটি গরিব-দুঃখীদের মাঝে বিলিয়ে দিলেন"।

থামলো মুসাফির। তারপর থলে থেকে পানির পাত্র বের করে কয়েক ঢোক পানি পান করল। সূর্যের প্রখর রোদ তখনও চারদিকে ছড়িয়ে আছে। ঘাম ঝরে পড়ছে তার কপাল বেয়ে। কিন্তু এই তীব্র গরমেও মুসাফিরের গল্পের শ্রোতারা একইভাবে বসে আছে। একমনে শুনে যাচ্ছে কাহিনী। কিছুক্ষণ পর মুসাফির আবার শুরু করলো, "সেই রাতেই খলীফা হারুন-উর-রশীদ স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি জান্নাতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সেখানে একটি অবিশ্বাস্য সুন্দর ও আলোকময় প্রাসাদ দেখতে পেলেন। প্রাসাদের প্রবেশদ্বারে তার স্ত্রী যুবাইদার নাম লেখা রয়েছে। খলীফা যখন প্রাসাদে প্রবেশ করতে চাইলেন, তখন প্রাসাদের প্রহরীরা তাকে আটকে দিয়ে বললো, হে খলীফা, এটি আপনার প্রাসাদ নয়। এটি রানি যুবাইদার। সকালে খলীফার ঘুম ভাঙলে তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। রানির কাছে রাতের সব ঘটনা খুলে বললেন এবং জানতে চাইলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম আপনার নামে বেহেশতে এক নয়নাভিরাম সুন্দর প্রাসাদ, রানি। আপনি কী এমন আমল করেছিলেন? যুবাইদা তখন বাহলুল পাগলের কাছ থেকে এক স্বর্ণমুদ্রায় জান্নাতের প্রাসাদ কেনার ঘটনাটি খুলে বললেন।

সব শুনে খলীফা হারুন-উর-রশীদ দ্রুত বাহলুলের খোঁজে বের হলেন। তিনি দেখলেন, বাহলুল আজও রাস্তার পাশে বসে মাটিতে ঘর আঁকছেন। খলীফা হন্তদন্ত হয়ে বাহলুলের কাছে গিয়ে বললেন, বাহলুল! তুমি কি আজ বেহেশতের প্রাসাদ বিক্রি করবে? আমি তা কিনতে চাই। বাহলুল খলীফার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, হ্যাঁ খলীফা, বিক্রি করব। তবে আজকের দাম অনেক বেশি। খলীফা জিজ্ঞেস করলেন, কত দাম? বাহলুল বললেন, আপনার পুরো রাজত্ব এবং রাজকোষের সমস্ত ধন-সম্পদ দিলেও এই প্রাসাদের দাম শোধ হবে না। খলীফা অবাক হয়ে বললেন, গতকাল আমার স্ত্রীর কাছে মাত্র একটি স্বর্ণমুদ্রায় বিক্রি করলে আর আজ আমার কাছে পুরো রাজত্ব চাচ্ছ কেন? বাহলুল তখন খলীফাকে উদ্দেশ্য করে একটি ঐতিহাসিক জবাব দিলেন: খলীফা! রানি যুবাইদা যখন গতকাল প্রাসাদটি কিনেছিলেন, তখন তিনি না দেখে, শুধু বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে আল্লাহর এক অভাবী বান্দাকে সাহায্য করার নিয়তে কিনেছিলেন। আর আপনি আজ জান্নাতের প্রাসাদের সৌন্দর্য স্বপ্নে দেখে, লোভের বশে তা কিনতে এসেছেন। না দেখে বিশ্বাস করার নামই হলো ঈমান, আর দেখার পর তো সবাই বিশ্বাস করে। তাই আজ আপনার পুরো রাজত্ব দিলেও এই জান্নাতের প্রসাদ কেনা সম্ভব নয়। এই গল্পটি আমাদের শেখায় যে, আল্লাহর পথে দান বা যেকোনো ভালো কাজ হতে হবে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, লোকদেখানো ভাবমুক্ত এবং বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে। কোনো জাগতিক লোভ বা প্রতিদানের আশা করে করা ভালো কাজের মূল্য আল্লাহর কাছে থাকে না"।

মুসাফিরের কথা শেষ হতেই চারপাশে কিছুক্ষণ নীরবতা নেমে এল। এতক্ষণ যে বাজারে মানুষের কোলাহল, ফেরিওয়ালাদের হাঁকডাক আর ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে মুখর ছিল, সেই জায়গাতেই যেন মুহূর্তের জন্য অন্য এক নীরবতা জন্ম নিল। ইসমাইল কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, মহাপুরুষ, আজ পর্যন্ত অনেক গল্প শুনেছি। কিন্তু এমন গল্প কখনো শুনিনি। মুসাফির মৃদু হাসল। গল্পটা আমার নয়। আমি শুধু তোমাদের শোনালাম। তবে আপনি এসব গল্প কোথায় পান?–ইসমাইল আবার জিজ্ঞেস করল। মুসাফির তার কাঁধের চাদরটি ঠিক করতে করতে বলল, পথে।

-পথে?

-হ্যাঁ। পৃথিবীর পথে পথে হাঁটলে গল্পের অভাব হয় না।

ইসমাইল এবার আরও কাছে এগিয়ে এল। তাহলে আপনি কে?

মুসাফির এবার কোনো উত্তর দিল না। শুধু চারদিকে একবার তাকাল। তারপর ধীরে ধীরে বাজারের ভিড়ের দিকে হাঁটতে শুরু করল। ইসমাইলসহ সবাই একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা একজন লোকের চোখ তার ওপর থেকেই সরল না। লোকটি সাধারণ পোশাকে ছিল। কিন্তু তার চোখে ছিল তীক্ষ্ণ সতর্কতা। কিছুক্ষণ মুসাফিরকে অনুসরণ করার পর সে হঠাৎ পেছনে ফিরে আরেকজনকে ইশারা করে বললো, ওই লোকটাকে নযরে রাখো। কিছুক্ষণ পর দুজন লোক মুসাফিরের পিছু নিল। মুসাফির তখন বাজারের এক সরু গলির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ পেছন থেকে একজনের কণ্ঠ ভেসে এল–এই! দাঁড়াও! মুসাফির থামল না। দাঁড়াও বলছি! এবার সে ধীরে ধীরে ফিরে তাকাল। দুজন লোক দ্রুত তার দিকে এগিয়ে আসছে। তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। মুসাফির মৃদু হেসে বলল, কোথায়? লোকটি কঠোর স্বরে বলল, সুলতানের দরবারে। তোমার পরিচয় নিয়ে কিছু প্রশ্ন আছে। মুসাফির এবার তার দিকে তাকাল। ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল সেই রহস্যময় হাসি। বললো, তাহলে চলুন। কিন্তু পরমুহূর্তেই বাজারের ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ ধুলোর ঝাপটা উঠল। লোক দুজন চোখ ঢেকে এক মুহূর্তের জন্য পেছনে সরে গেল। ধুলো থিতিয়ে গেলে তারা দেখলো মুসাফির নেই! একজন হতভম্ব হয়ে চারদিকে তাকিয়ে বলল, এতক্ষণ তো এখানেই ছিল! অন্যজন ফিসফিস করে বললো, লোকটা কে?

ফজরের আভা

গল্প পূর্ণ কর...

ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয়েছে। ট্রেনের শব্দে ঘুম ভাঙলো নাদিমের। গতরাতও ফজরের সময় ট্রেন চলছিল। পাশের রুমে মামা ঘুম থেকে উঠেছেন। নড়াচাড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। দূরের কোন মসজিদে ইমাম সাহেব দুআ-দুরূদ পড়ছেন। মামা রুমের বাতির সুইচ অন করলেন। নাদিম বলল, মেজো মামা, দরজা খোলা আছে। মসজিদে যাবেন? মামা বললেন, তৈরি হও। উযূ করে টর্চলাইট হাতে দুজনে বেরিয়ে পড়লেন। পথিমধ্যে মতি মিয়ার সাথে দেখা। মসজিদে যাওয়ার আগে তার ছোট ঘর। মতি মিয়া, কয় মিনিট দেরি? দুই মিনিটের মধ্যে ট্রেন চলে আসবে। এক মিটার প্রস্থের রেল পথ দুই সেকেন্ডে পাড়ি দেওয়া যায়। মামা নাদিমের হাত ধরে রেলগেটের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিকট বজ্রধ্বনি ও লোহার পাতের শব্দ। ট্রেনটি খুব দ্রুত পার হল। মামা বললেন, চলো। আজ মসজিদে মুয়াযযিন সাহেব নেই। ইমাম সাহেব ছুটিতে গেলে মতি মিয়া মুয়াযযিন ও মামা হন মসজিদের ইমাম। মতি মিয়া তার ভরাট সুরে আযান দিতে শুরু করলেন। চতুর্দিক মুখরিত হতে লাগলো আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার.....

(নাদিমের সকালটি কিভাবে কেটেছে ৩০০ শব্দের মধ্যে গল্পটি সম্পূর্ণ করে পাঠিয়ে দাও। সেরা লেখকের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার)

কে বলেছে মরছে ওরা
জিতছে তাঁরা রাত্রি-দিন
হাসতে হাসতে শাহাদাতে
লুটায় গাযা-ফিলিস্তিন।

ছড়া/কবিতা পূর্ণ কর...

(উপরোক্ত ছড়াংশটি স্বরবৃত্ত ছন্দে লিখা। স্বরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট হচ্ছে (সংক্ষেপে) এর বদ্ধস্বর এবং মুক্তস্বর উভয়টিই ১ মাত্রা হিসাবে গণনা করা হয়। স্বরবৃত্ত ছন্দের নিয়ম মেনেই বাকি অংশ পূর্ণ করবে। সেরা ছড়াকারের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার)

গত সংখ্যায় যাদের পূর্ণ করা গল্প নির্বাচিত হয়েছে [প্রথমজন পুরস্কৃত]

শাহরিয়ার আবিদ # রাইয়ান আহমদ # মো. রুয়েল মিয়া # হাবিবুর রহমান # এবিএম নাসিম # আসফার # তাওহীদ চৌধুরী # আবু বকর # উবাইদুল্লাহ আহনাফ # আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ জাকারিয়া # মো. আশরাফুল ইসলাম # মো. উমেদুল ইসলাম রুহেল # আতিকুর রহমান নাইম।

গত সংখ্যায় যাদের পূর্ণ করা ছড়া নির্বাচিত হয়েছে [প্রথমজন পুরস্কৃত]

লুৎফুর রহমান শাহান # টি এ সুলেমান # জাবির হাসান।

মীলাদের দিনে

শাহরিয়ার আবিদ

(গত সংখ্যার গল্পের বাকি অংশ)

নাবিল জিজ্ঞেস করল, কর্মসূচিটা কী?। ফরহাত ভাই মুচকি হেসে বললেন, না, না এখন বলা যাবে না। ধৈর্য ধর। যখন-তখন বড় মৌলভী সাহেব এসে পড়বেন। চল, মীলাদে যাই। তারা গিয়ে দেখল, বড় মৌলভী সাহেব এসে পড়েছেন। তাছাড়া গ্রামের অনেক মুরুব্বী, তরুণ ও যুবকও মীলাদ-মাহফিলে শরীক হওয়ার জন্য এসেছেন। আর নাবিলের চাচাতো ভাই তালহা সবাইকে আতর লাগিয়ে দিচ্ছে। তারপর যিকরের পর শুরু হলো তাওয়াল্লুদ পাঠ। তাওয়াল্লুদ পাঠ শেষে সবাই দাঁড়িয়ে সালাত ও সালাম তথা "ইয়া নাবী সালাম আলাইকা" পড়লেন। সালাত-সালাম শেষে এখন দুআ করার পালা। সবার অনুরোধে বড় মৌলভী সাহেব দুআ শুরু করলেন। ফরহাত ভাই নাবিলকে বললেন, যা ঘরে বলে আয়, মহিলারাও যেন দুআতে শরীক হন। নাবিল তাই করল। মুনাজাতের ফাঁকে সে তার গ্রামের বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। এই তুই জানিস? ফারহাত ভাইয়ের সঙ্গে আমি তাদের কী যেন একটা কর্মসূচিতে যাব। তার বন্ধু আরিফ বলল, কী সেই কর্মসূচি? নাবিল বলল, আমিও জানি না রে। দুআ শেষে ফারহাত ভাই নাবিল ও তার বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বললেন, দুআয় মনোযোগ না থাকলে দুআ কবুল হয় না। নাবিল ও তার বন্ধুরা বিষয়টি বুঝতে পারল। ফারহাত ভাই চলে গেলেন শিরনি বিতরণ করতে। সাথে নাবিলও গেল। পাড়ার অনেক ছেলে-মেয়ে এসেছে শিরনি খেতে। ফারহাত ভাই শিরনি বিতরণ করছেন; সাথে আছে নাবিলও। শিরনির রং ও গন্ধে নাবিল আর লোভ সামলাতে পারছে না। হাত বাড়াল শিরনির গামলার দিকে। নাবিলের হাত সরিয়ে ফারহাত ভাই বললেন, যারা বিতরণ করে তাদের সবার শেষে খেতে হয়। এটাই ভদ্রতা। নাবিল বলে, যদি না থাকে?। ফারহাত ভাই বললেন, না থাকলে নাই। অবশেষে শিরনি বিতরণ শেষ হলো। নাবিল জিজ্ঞেস করল, এবার খেতে পারি?। ফারহাত ভাই বললেন, হ্যাঁ, এখন খেতে পারো। নাবিল ফারহাত ভাইয়ের পিছু করতে লাগল। ফারহাত ভাই বললেন, কী রে? কিছু বলবি? নাবিল বলল, ইয়ে মানে! ঐ যে কর্মসূচি? ফারহাত ভাই মুচকি হেসে বললেন, আমাদের শহরে যে ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে বড় একটা র‍্যালি হয় আগামীকাল সেখানে যাওয়ার জন্য আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে দুইটা বাস রিজার্ভ করেছি। ঠিক ১২:২০-এ বাস ছাড়বে।

নাবিল তো মহাখুশি। সে মোবাইলে র‍্যালির ভিডিও দেখত আর ভাবত , কত মানুষ। ইশ! আমিও যদি যেতে পারতাম? তার এই আশাটা পূরণ হতে যাচ্ছে। নাবিল দৌড়ে গিয়ে তার মাকে র‍্যালিতে যাওয়ার জন্য বলল। তার মা প্রথমে সে ছোট বলে তাকে যেতে দিচ্ছিলেন না। পরে ফারহাত ভাইয়ের সঙ্গে যাবে বলে রাযী হলেন। পরদিন সে গোসল করে নতুন পাঞ্জাবি পরে ফারহাত ভাইয়ের জন্য অপেক্ষার প্রহর গুনতে লাগল। ১২:০৫ মিনিটে ফারহাত ভাই এলেন তাকে নেওয়ার জন্য। নাবিলের মা বললেন, ভাইয়ের হাত ছাড়বি না। আর কোনো দুষ্টুমিও করবি না। আর বাবা ফারহাত! ওকে একটু দেখে রেখো। ফারহাত ভাই বললেন, ঠিক আছে চাচি।

নাবিল ফারহাত ভাইয়ের হাত ধরে চলতে শুরু করল। যেতে যেতে ফারহাত ভাই বললেন, বুঝলি নাবিল! আমি যখন তোর মতো ছোট ছিলাম তখন আমারও খুব ইচ্ছে হতো র‍্যালিতে যাওয়ার। কিন্তু যেতে পারতাম না। তাই তোকে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে আমি আমার ছোটবেলার শখটা পূরণ করছি। এটা বলে ফারহাত ভাই দীর্ঘ শ্বাস ফেললেন। কিছুক্ষণ হাঁটার পর তারা বাসের কাছে এসে পৌঁছাল। ১২:৩০-এ বাস ছাড়ার কথা থাকলেও বাস সবাইকে নিয়ে ১২:২৭ এর দিকে র‍্যালির উদ্দেশ্যে রওনা হলো। চলার পথে তারা সবাই নাতে-রাসূল (সা.) গাইতে গাইতে গেলেন। একটানা চলার পর বাস থামলো। নাবিল বাইরে থাকিয়ে দেখল আরও অনেক বাস এসেছে। ফারহাত ভাই বললেন, নেমে আয়। আমরা চলে এসেছি। তারা সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, ইমাম সাহেব নামাযের সালাম ফিরিয়ে মুনাজাত করছেন। তারা বাসে থাকা অবস্থায়ই যুহরের আযান হয়ে গিয়েছিল। নাবিল বলল, এখন কী হবে? ফারহাত ভাই বললেন, চিন্তার কারণ নেই। এখানে অনেক মানুষ; সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে নামায আদায় করা সম্ভব নয়। তাই এখানে ২-৩ জামাআতে নামায আদায় হয়। চল আমরা উযূ করে আসি। তারা নামায আদায় করে বাইরে বের হলো। কিছুক্ষণ পর র‍্যালি শুরু হয়। অনেক জায়গা থেকে অনেক শিল্পী এসেছেন। তাদের কণ্ঠে গাওয়া নাতে-রাসূলের সাথে র‍্যালিতে আগতরাও কণ্ঠ মিলাতে লাগলেন। নাবিল দেখতে পেলো অনেক নিউজ চ্যানেল এসেছে; সংবাদ ধারণ করার জন্য। হঠাৎ তাদের পিছন দিক থেকে একটি পানি ভর্তি পিকআপ এসে তাদেরকে পানি দিয়ে দিয়ে সামনে চলে গেল। পথিমধ্যে ফারহাত ভাই নাবিলকে সিঙ্গারা, আইসক্রিম খাওয়ালেন। বললেন, কী রে! র‍্যালিতে এসে কেমন লাগছে? নাবিল বলল, খুব ভালো। দেখতে দেখতে র‍্যালিটি নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে যেখান থেকে শুরু হয়েছিল সেখানে এসে শেষ হলো।

নাবিল অনেকের পড়নে সবুজ একধরনের জ্যাকেট দেখতে পেয়ে ফারহাত ভাইকে জিজ্ঞেস করল, তারা কারা? আর তারা সবাই এমন পোশাক পড়েছে কেন? জবাবে ফারহাত ভাই বললেন, তারা হলো স্বেচ্ছাসেবক। অর্থাৎ তারা নিজের ইচ্ছায় সেবা দেয়ার জন্য এসেছেন । র‍্যালিতে যে কোনো ধরনের সাহায্যে তারা এগিয়ে আসেন। আগে দেখলে না যে র‍্যালির সময় তারা আমাদেরকে পানি দিলেন। নাবিল বিষয়টি বুঝতে পারল। র‍্যালির বিদায়ী মুনাজাত শেষে সবাইকে শিরনি বিতরণ করা হলো। তারা শিরনি খেয়ে আসরের নামায পড়ে কিছুক্ষণ হুযুরের বয়ান শুনলেন। বয়ানে হুযুর বললেন, রাসূল (সা.)-এর জন্মের খুশিতে কুখ্যাত কাফির আবূ লাহাব তার দাসীকে আযাদ করার কারণে জাহান্নামের শাস্তি কিছুটা কম হয়। আর আমরা তো রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উম্মত। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদেরকে এর উত্তম জাযা দান করবেন । এটা শুনে নাবিল আরোও খুশি হয়ে গেলো। বয়ান শেষ হলো। সবাই বাসে আসার পর বাস ছেড়ে দিল বাড়ির উদ্দেশ্যে। আর নাবিল মনে মনে ভাবতে লাগল, আবার কবে আসবে ১২ই রবীউল আউয়াল। কবে আসা হবে র‍্যালিতে।



আমীর আবদুল কাদির আল-জাযাইরী
এক সূফী-মুজাহিদের আখ্যান

ইতিহাস অবলম্বনে রূপায়ণ: মুনিব



১ ১৯ শতক, যখন ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের কালো মেঘ মুসলিম বিশ্বকে গ্রাস করছিল, তখন উত্তর আফ্রিকার দুর্গম ভূখণ্ড থেকে এক আশার আলো প্রকাশ পায়। আমির আব্দুল কাদির ইবন মুহিউদ্দীন আল-জাযাইরী (রহিমাহুল্লাহ) ১৮০৮ সালে আলজেরিয়ার মাস্কারার কাছে নবী দৌহিত্র হাসান (রা.) এর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। যিনি ছিলেন আলজেরিয়ার আযাদী সংগ্রামের মহানায়ক।

২ আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পশ্চিমে, ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত নৌপ্রধান খায়ের আদ-দীন বারবারোসার স্মৃতি বিজড়িত ও উসমানী খিলাফতের অন্যতম শক্তিশালী নৌ ঘাঁটিগুলো ছিল আলজেরিয়ায়।



৩ তাঁর বেড়ে ওঠা আলজেরিয়ার বিখ্যাত (কাদরিয়া তরীকার এক) সূফী পরিবারে। শৈশবেই তিনি তাঁর পিতার জাওইয়াতে(খানকায়)শিক্ষালাভ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন মাত্র ১৪ বছরে কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন এবং আদাব, তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও তাসাউফসহ বিভিন্ন ইসলামী শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন।

১৮২৫ সালে পিতার সঙ্গে হজ পালনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং মদীনা শরীফ যিয়ারত করেন। পরে দামেস্ক ও বাগদাদ সফর করেন, এ সময় তিনি ইবনে আরাবী ও আব্দুল কাদির জিলানী (র.)-এর মাযার যিয়ারত করেন। পরবর্তী বছর পুনরায় হজ পালন করেন। এসব সফর ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা তাঁর ধর্মীয় চিন্তা, আদর্শ ও পরবর্তী জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

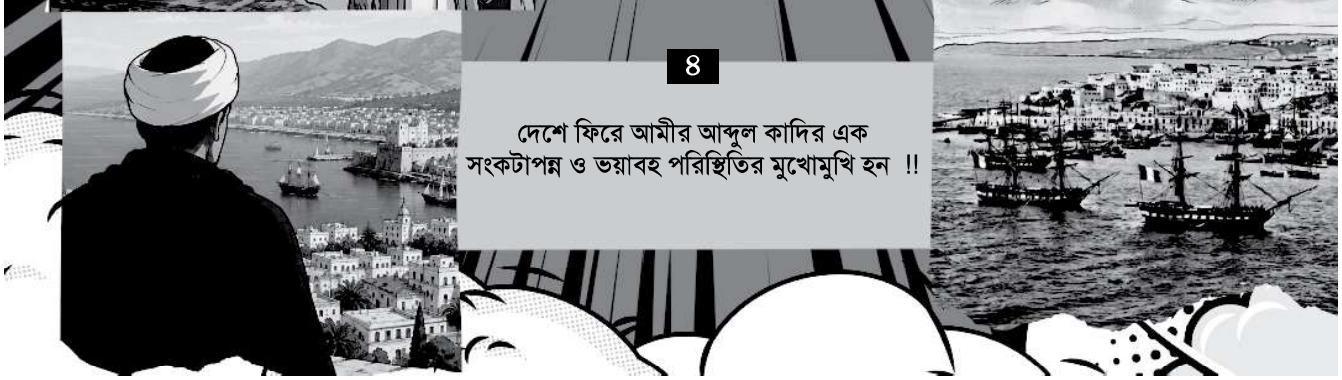

৪ দেশে ফিরে আমীর আব্দুল কাদির এক সংকটাপন্ন ও ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হন !!



৫

ফ্রান্স সে সময় আলজেরিয়ার কাছে তার বিশাল ঋণ পরিশোধ করতে পারছিল না। তখন আলজেরিয়ার সাথে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।





৬

ফ্রান্স আলজেরিয়া আক্রমণ করে হুসাইনকে(তৎকালীন শাসককে)নির্বাসিত করে এবং উসমানী খিলাফতের সামরিক দুর্বলতার সুযোগে বিভিন্ন বন্দর দখল করে নেয়।

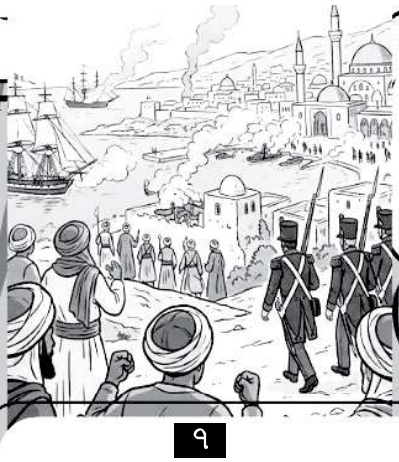

৭

ক্ষমতার এই পালাবদলে আলজেরিয়াতে দেখা দেয় এক ভয়াবহ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংকট। আলজেরিয়ার জনগণ তখন ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

৮

আব্দুল কাদিরের পিতাকে দখলদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অভিযানের নেতৃত্ব দিতে বলা হয়। মুহিউদ্দীন খুব বয়স্ক ছিলেন, এই কারণে তিনি এই পদটি প্রত্যাখ্যান করেন । এরপর ১৮৩২ সালে আলজেরিয়ার ঘরিস সমভূমিতে একটি ইলমগাছের নিচে বিভিন্ন গোত্রের নেতারা ২৪ বছর বয়সি আব্দুল কাদিরের হাতে বাইআত গ্রহণ করেন।তারা আব্দুল কাদিরকে আমীর আল-মু'মিনিন নির্বাচিত করেন।



১০

১৮৩৫ সালের ২৮ জুন সংঘটিত মাকতা নদীর যুদ্ধ আমীর আবদুল কাদিরের সামরিক দক্ষতার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। ফরাসি জেনারেল ক্যামিল ট্রেজেলের বাহিনীর বিরুদ্ধে তিনি স্থানীয় ভূপ্রকৃতির সুবিধা কাজে লাগান। নদীসংলগ্ন জলাভূমি ও দুর্গম পথের কারণে ফরাসি বাহিনীর অগ্রযাত্রা ব্যাহত হলে তাঁর যোদ্ধারা কৌশলগত আক্রমণ চালান। যুদ্ধে ফরাসি বাহিনী গুরুতর ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং জেনারেল ট্রেজেলকে পরবর্তীতে প্রত্যাহার করা হয়।এই লড়াই আলজেরীয় প্রতিরোধযোদ্ধাদের মনোবল দৃঢ় করে।

৯

তাঁর ১৮৩০ থেকে ১৮৪৭ সাল (প্রায় ১৭ বছর) পর্যন্ত ফরাসি ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম ছিল সুপরিকল্পিত প্রতিরোধের এক অনন্য অধ্যায়। তিনি গেরিলা আক্রমণ, অতর্কিত হামলা এবং শত্রুর রসদ সরবরাহে বাধা সৃষ্টির মতো কৌশল ব্যবহার করে ফরাসি বাহিনীকে বারবার বিপাকে ফেলেন। তাঁর বিচক্ষণ রণকৌশল ও অবিচল প্রতিরোধ ফরাসি বাহিনীর জন্য আলজেরিয়া দখলকে কঠিন করে তোলে।



১১

বারবার পরাজিত হয়ে ফরাসি বাহিনী আমীর আবদুল কাদিরের সাথে সন্ধিচুক্তি (১৮৩৭-টাফনা চুক্তি) করতে বাধ্য হয় এবং আলজেরিয়ার বিস্তীর্ণ অভ্যন্তরীণ অঞ্চলে আমীরের শাসনব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

চলবে.....

হোজ্জার পোলাও খাওয়া

ভাবনা ও রূপায়ণ
রাহি

১
মোল্লা নাসিরুদ্দীন আর তাঁর এক বন্ধু একদিন ঠিক করলেন তাঁরা একটা বাগানে গিয়ে পোলাও রান্না করে খাবেন।

২
হাঁড়িকুঁড়ি, মাল-মসলা নিয়ে বাগানে গেলেন তাঁরা।

নাসিরুদ্দীন, আমি তো কিছুই পারি না। উনান ধরাতে পারি না, হাড়ি চড়াতে জানি না, গাজর কাটতেও পারি না। আমি বরং একটু ঘুমিয়ে নিই! রান্না হলে আমাকে ডেকে তুলো।

৩
নাসিরুদ্দীন উনান ধরালেন, গাজর কাটলেন, হাঁড়ি চড়ালেন। রান্নাও করলেন একাই।

৪
তারপর পেট ভরে পোলাও খেয়ে আচ্ছা করে ঢেকুর তুলতে তুলতে বাসন মাজতে লাগলেন।

ঢেকুর...

৫
এমন সময় ঘুম থেকে উঠে চোখ ডলতে ডলতে বন্ধুটি বললেন,

নাসিরুদ্দীন, আমাকে না ডেকে গোগ্রাসে একাই পোলাও গিললে তুমি...! বর্বর, লোভী কোথাকার!

কী করব বন্ধু, তুমি তো কিছুই পারো না, কিছুই জানো না। তাই মনে হলো পোলাওটাও খেতে জানো না তুমি। তাই একাই খেলাম রান্না করা পোলাও।

নাবীয়ে আরাবী

জাবির হাসান

পৃথিবীর যতো রূপ
ঢেলে দিয়ে সব
তাঁরে যেনো সৃজিলেন
জগতের রব!

স্বর্গে বা মর্তে সে
এতোটা অতুল
যতো না উপমা আনো
ভুল সবই ভুল।

রূপে গুণে তাঁর মাঝে
কীযে সমাহার
রবি-শশী, হুর-পরী
গিলমানও ছাড়।

প্রতিটি মুমিন হৃদে
তাঁর প্রতি টান
নাবীয়ে আরাবী তিনি
হাদীয়ে জাহান।

শীতের দিনের বার্তা

আবুল আহসান ইয়াসিন

নীল আকাশে ভাসছে দেখি
সাদা মেঘের ভেলা
নদীর পাশে চোখ জুড়ানো
কাশফুলেদের খেলা

পথের ধারে শিউলি ঝরে
সুবাস ছড়ায় ঘ্রাণে
প্রকৃতি যে পূর্ণতা পায়
মাঠের আমন ধানে

গাছের পাতায় লতার শাখায়
সবুজ সমারোহ
জোছনা রাতের স্নিগ্ধ বাতাস
জাগায় কী যে মোহ!

ভোরের বেলা হিমেল হাওয়া
শিশির পড়ে ঘাসে
শরৎ যেন শীতের দিনের
বার্তা নিয়ে আসে।

শরতের রূপ

মোঃ সৈয়দুল ইসলাম

ঋতু যায় ঋতু আসে
ছয় ঋতু বারো মাসে
শরতের দূর্বাঘাসে—
শিশিরবিন্দু মুচকি হাসে।

সুরমা নদীর দুই কূলে
দোলা দেয় কাশফুলে
মাঝি যায় পাল তুলে
মন কাড়ে শিউলি ফুলে।

শরতের নীল আকাশে
সাদা মেঘ ওড়ে বাতাসে
ভাদ্র আর আশ্বিন মাসে
খালে-বিলে শাপলা হাসে।

শরতের রূপ দেখে
কতজনে কাব্য লেখে
খোকাখুকি ছবি এঁকে
হৃদয় মাঝে দেয় রেখে।

অন্তর্যামী

এম শামছুল ইসলাম সুহেব

হাত তুলেছি তোমার দ্বারে আমি গুনাহগার
মাফ করে দাও আমায় ওগো দয়াল পরওয়ার!
নিত্য আমি বুঝে-না বুঝে করি কত পাপ
করজোরে তোমার কাছে চাইছি আজি মাফ!
ফালি ফালি পাপের বোঝা বুকে বয়ে যাই
তোমার দয়া ছাড়া আর আশ্রয় কোথাও নাই!
বেড়ে গেছে গুনাহ আমার ছাড়িনি তবু আশা
ক্ষমা করবে তুমি আমায় হৃদয়ে এ প্রত্যাশা!
গভীর মনে তাওবাহ করি কবূল করো সাঁই
তুমি ছাড়া এই অধমের যাওয়ার জায়গা নাই!
মনের সকল না বলা কথা শুধুই জানো তুমি
নিজ গুণেতে ক্ষমা করো ওগো অন্তর্যামী!

মাদীনা

এস এম রুহুল আমিন

হে মাদীনা—
তোমার বক্ষে শুয়ে আছেন
আল্লাহর প্রিয় নবী
যার উসীলায় সৃজন হলো
তামাম এই পৃথিবী।

হে মাদীনা—
তোমার বুকে মোরে
দেবে কি একটুখানি ঠাঁই
তোমার শহরের ধূলিকণা
আমার গায়ে মাখতে চাই।

জানার আছে অনেক কিছু

উত্তর সাইপ্রাস বা তুর্কি সাইপ্রাস নিয়ে কিছু তথ্য

উত্তর সাইপ্রাস (অফিসিয়ালি তুর্কি প্রজাতন্ত্র উত্তর সাইপ্রাস বা TRNC) হলো ভূমধ্যসাগরের বুকে অবস্থিত একটি অনন্য এবং রাজনৈতিকভাবে জটিল অঞ্চল। ১৯৭৪ সালের সংঘাতের পর সাইপ্রাস দ্বীপটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। দ্বীপটির দক্ষিণ ও প্রধান অংশটি সাইপ্রাস প্রজাতন্ত্র (গ্রিক সাইপ্রাস) নামে পরিচিত, যার মোট আয়তন প্রায় ৫,৮৯৬ বর্গ কিলোমিটার, যা সমগ্র দ্বীপের প্রায় ৬৪ শতাংশ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এই অংশে বর্তমানে প্রায় ৯ লক্ষ ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষ বসবাস করেন, যাদের সিংহভাগই গ্রিক সাইপ্রিয়ট। অন্যদিকে, দ্বীপটির উত্তর অংশে অবস্থিত উত্তর সাইপ্রাস (তুর্কি সাইপ্রাস) তুলনামূলকভাবে ছোট। এর মোট আয়তন প্রায় ৩,৩৫৫ বর্গ কিলোমিটার, যা সমগ্র দ্বীপের প্রায় ৩৬ শতাংশ এলাকা। এই অঞ্চলে বর্তমানে আনুমানিক ৩ লক্ষ ৯০ হাজারেরও বেশি মানুষের বসবাস, যাদের মূল জনগোষ্ঠী তুর্কি মুসলিম সাইপ্রিয়ট। এটি তার চমৎকার সমুদ্রসৈকত, প্রাচীন দুর্গ, ক্রুসেডার ইতিহাস এবং অনন্য ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের জন্য পরিচিত। তবে মুসলিম বসতি হওয়ায় ইউরোপীয় ষড়যন্ত্রকারীরা এর স্বীকৃতি আটকে দেয়। বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে তুরস্ক ছাড়া অন্য কোনো দেশ এটিকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। আজ থাকছে তুর্কি সাইপ্রাস নিয়ে ১০ টি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

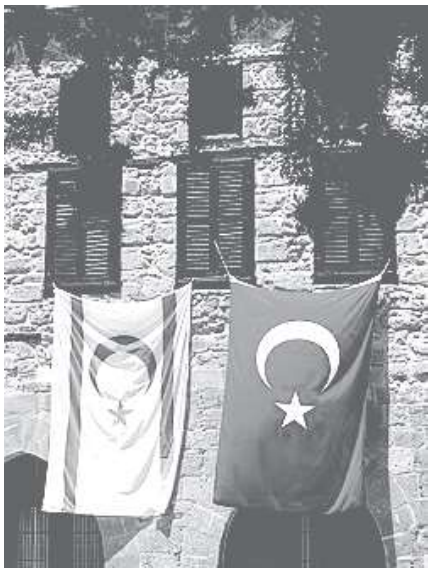

• **সাহাবীর স্মৃতিধন্য ভূমি:** উত্তর সাইপ্রাসের প্রাচীন শহর ফামাগুস্তায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিখ্যাত সাহাবী হযরত উবাদা ইবন সামিত (রা.) এবং তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে হারাম (রা.)-এর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তাঁরা হিজরী ২৮ সনে ইসলামের প্রথম নৌ-অভিযানের সময় এই দ্বীপে এসেছিলেন এবং উম্মে হারাম (রা.) এখানেই ইন্তিকাল করেন।

• **গির্জা থেকে মসজিদে রূপান্তর:** 'লালা মুস্তাফা পাশা মসজিদ'টি (সাবেক সেন্ট নিকোলাস ক্যাথেড্রাল) ইসলামী স্থাপত্যের এক অনন্য নিদর্শন। ১৫৭১ সালে অটোমানরা সাইপ্রাস জয় করার পর এই রোমান শৈলীর বিশাল গির্জাটিকে মসজিদে রূপান্তর করেন এবং এর সাথে একটি চমৎকার মিনার যুক্ত করেন।

• **বিভাগীয় রাজধানী ও গ্রিন লাইন:** সাইপ্রাসের রাজধানী নিকোসিয়া (লেফকোসা) হলো বিশ্বের একমাত্র বিভক্ত রাজধানী। শহরের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে জাতিসংঘের বাফার জোন। এই শহরের তুর্কি অংশে আযানের মধুর ধ্বনি এবং প্রাচীন অটোমান স্থাপত্যের সূফী আমেজ এক শান্তিময় পরিবেশ তৈরি করে।

• **হালাল খাবারের সহজপ্রাপ্যতা:** মুসলিম প্রধান অঞ্চল হওয়ায় উত্তর সাইপ্রাসের প্রায় সমস্ত রেস্তোরাঁ ও খাদ্য দোকানে সম্পূর্ণ হালাল খাবার পাওয়া যায়। ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও এখানে মুসলিম পর্যটকদের খাবারের জন্য কোনো বেগ পেতে হয় না।

• **ঐতিহাসিক বুয়ুক হান (The Great Inn):** ১৫৭২ সালে নির্মিত এই ঐতিহাসিক সরাইখানাটি অটোমান ইসলামী স্থাপত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। এর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটি সুন্দর উযূখানা ও ক্ষুদ্র মসজিদ (মাসজিদ)। প্রাচীনকালে এটি দূর-দূরান্ত থেকে আসা মুসলিম ব্যবসায়ী ও মুসাফিরদের বিশ্রামের আশ্রয়স্থল ছিল।

• **সূফী সংস্কৃতির প্রভাব:** উত্তর সাইপ্রাসে ঐতিহাসিক 'মেভলেভি টেক্কে' বা সূফী দরগাহ রয়েছে। অটোমান আমলে এটি ছিল জালালউদ্দীন রুমী (র.)-এর দর্শনে বিশ্বাসী সূফী সাধকদের আধ্যাত্মিক চর্চাকেন্দ্র, যা বর্তমানে একটি সমৃদ্ধ জাদুঘর হিসেবে সংরক্ষিত।

• **ওথেলো দুর্গের ইতিহাস:** ফামাগুস্তা শহরের বিখ্যাত 'ওথেলো টাওয়ার' বা দুর্গটি বিখ্যাত ইংরেজ লেখক উইলিয়াম শেক্সপিয়রের কালজয়ী নাটক 'ওথেলো'-এর পটভূমি হিসেবে পরিচিত।

• **ঐতিহ্যবাহী অটোমান কবরস্থান ও মাযার:** উত্তর সাইপ্রাসের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছে বহু পুণ্যবান মুসলিম সাধক ও ওলী-আউলিয়াদের মাযার এবং অটোমান যুগের প্রাচীন কবরস্থান। এসব স্থাপনার ক্যালিগ্রাফি ও স্থাপত্যশৈলী মুসলিম ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে।

• **কচ্ছপদের নিরাপদ প্রজনন কেন্দ্র:** উত্তর সাইপ্রাসের আলাগাদি সমুদ্রসৈকতটি বিলুপ্তপ্রায় গ্রিন টার্টল এবং লগারহেড কচ্ছপদের অন্যতম প্রধান ডিম পাড়ার স্থান। প্রতি বছর হাজার হাজার কচ্ছপের ছানা ডিম ফুটে বের হয়ে সমুদ্রের দিকে যাত্রা করে, যা আল্লাহর অপরূপ সৃষ্টির এক জীবন্ত নিদর্শন।

• **বন্য গাধার অভয়ারণ্য:** কারপাজ উপদ্বীপের সংরক্ষিত প্রাকৃতিক অঞ্চলে শত শত বন্য গাধা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও পশুপাখির প্রতি সদয় হওয়ার ইসলামী মানবিক শিক্ষার এক সুন্দর উদাহরণ এই অভয়ারণ্য।

গ্রন্থনা: মোহাম্মাদ সিদ্দীক হায়দার



আন্দালিব ভাই সমীপে...

প্রিয় আন্দালিব ভাই
বিভাগীয় উপজেলা প্রতিনিধি সমাবেশ একটি সফল ও স্বার্থক অনুষ্ঠান হয়েছে। এর মাধ্যমে পরওয়ানার প্রচার ও প্রসার আরও বাড়বে বলে আমি আশাবাদী।

জাকির জাফরান
দক্ষিণ সুরমা, সিলেট

-আন্দালিব ভাই
পরওয়ানা শুরু থেকেই ব্যতিক্রমী উদ্যোগে পাঠকের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে। আপনিও একজন পাঠক হিসেবে পরওয়ানার প্রচার-প্রসারে সহযোগিতা করবেন বলে আমি বিশ্বাসী। চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

সদস্য কুপন

প্রিয় আন্দালিব ভাই, আমি 'আবাবীল ফৌজ' এর সদস্য হতে চাই। আমার বয়স ১৬ বছরের বেশি নয়। আমি ফৌজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিজেকে সচেষ্ট রাখবো।

নাম: ----------

পিতা/অভিভাবক: ----------

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ---------- শ্রেণি: ----------

গ্রাম: ---------- ডাক: ----------

থানা: ---------- জেলা: ----------

কুপনটি পূরণ করে ডাকযোগে নিচের ঠিকানায় অথবা ছবি তুলে ই-মেইলে পাঠিয়ে দাও।

আন্দালিব ভাই
পরিচালক, আবাবীল ফৌজ
মাসিক পরওয়ানা
বি.এন টাওয়ার, ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
সিলেট অফিস: পরওয়ানা ভবন ৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট সিলেট-৩১০০
Mobile: 01799 629090, E-mail: parwanaafbd@gmail.com

প্রিয় আন্দালিব ভাই
পরওয়ানা সেপ্টেম্বর সংখ্যায় আবাবীল ফৌজ আরও বড় পরিসরে এসেছে। যুক্ত হয়েছে নতুন কিছু। তা দেখে সত্যিই আমি খুশি হয়েছি। এখন থেকে পরওয়ানা পড়ার জন্য আরও বেশি উন্মুখ হয়ে থাকব।

মেহরিমা শাহরিন
ছাতক, সুনামগঞ্জ

-আন্দালিব ভাই
তোমার মতো শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করেই মূলত আবাবীল ফৌজ বিভাগ আরও বর্ধিত করা হয়েছে। তোমরা নিয়মিত পরওয়ানা পড়বে। আগামীতে শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হব ইনশাআল্লাহ।

প্রিয় আন্দালিব ভাই
আশা করি ভালো আছেন। পরওয়ানা আমার প্রিয় ম্যাগাজিন। এটা আমাকে অনেক উপকার দিয়েছে। আমি আজীবন পরওয়ানার সাথে থাকতে আগ্রহী।

জাবির আহসান
ইসলামিক একাডেমি, সিলেট

-আন্দালিব ভাই
প্রিয় জাবির, চিঠির জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তোমার অনুভূতির কথা শুনে বেশ ভালো লাগলো। পরওয়ানা হোক তোমার জীবনের অন্যতম সহায়ক বই। অনেক ভালো থেকো।

প্রিয় আন্দালিব ভাই
আমি এবছর এইচএসসি ফলপ্রার্থী। আমি ভালো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চাই। আমাকে কিছু পরামর্শ দিন।

আহমেদ পাভেল
হবিগঞ্জ, সিলেট

-আন্দালিব ভাই
কোন বিশ্ববিদ্যালয় ও কোন বিষয়ে পড়তে চান তা আগে থেকে ৩–৫টি সম্ভাব্য অপশন রাখুন। আবেদনসীমা, ভর্তি পরীক্ষার মানবণ্টন ও সিলেবাস ভালোভাবে জেনে নিন। বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ জ্ঞান এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মৌলিক ধারণাগুলো ভালোভাবে প্রস্তুত করুন। কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের গত ৫–১০ বছরের প্রশ্ন বারবার অনুশীলন করুন। নিয়মিত মডেল টেস্ট দিয়ে গতি ও নির্ভুলতা বাড়ান। প্রতিদিন ৪–৬ ঘণ্টা মনোযোগী পড়াশোনা আপনাকে কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রিয় আন্দালিব ভাই
আমি পরওয়ানার নতুন পাঠক হয়েছি। মাসের শুরুতে পরওয়ানার জন্য অধীর হয়ে থাকি। আমি কীভাবে নিয়মিত পরওয়ানা পেতে পারি?

খাইরুল আমিন সুজন
কুশিঘাট, সিলেট

-আন্দালিব ভাই
প্রথমেই আপনাকে অভিনন্দন। মাসের শুরুতে পরওয়ানা পেতে আপনি নিকটস্থ এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। অথবা আমাদের সোবহানীঘাট, সিলেট অফিস থেকে এসে সংগ্রহ করতে পারেন। ধন্যবাদ।

আন্দালিব ভাইয়ের চিঠি

প্রিয় বন্ধুরা,
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

দেখতে দেখতে ২০২৬ সালের আরও একটি মাস আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিল। শুরু হলো ইংরেজি বছরের দশম মাস অক্টোবর। নতুন মাসের নতুন এই দিনগুলো তোমাদের জীবনে নতুন কিছু শেখার, নতুন কিছু করার এবং নিজেকে আরও একটু গড়ে তোলার সুযোগ হয়ে আসুক।

মানুষের সামর্থ্য হয়তো সীমিত, কিন্তু স্বপ্ন, চেষ্টা আর সাহস যদি বড় হয়, তাহলে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। তাই কোনো কাজকে ছোট মনে করো না। প্রতিদিন একটি নতুন শব্দ শেখা, একটি ভালো বইয়ের কয়েক পৃষ্ঠা পড়া, কোনো একটি বিষয় জানা, নিজের ভুল স্বীকার করা কিংবা কাউকে একটি ভালো একটি উপদেশ দেওয়া—এসব ছোট ছোট কাজই একদিন বড় পরিবর্তনের ভিত্তি তৈরি করে।

বন্ধুরা,
তোমাদের মনে রাখতে হবে, জ্ঞান তোমাকে জানাবে পৃথিবীকে; আর ভালো চরিত্র তোমাকে শেখাবে পৃথিবীর সঙ্গে কীভাবে চলতে হয়। তাই পড়াশোনার পাশাপাশি সত্যবাদিতা, শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ, ভদ্রতা ও সহমর্মিতার চর্চা করো। আর একটি কথা—তুমি যদি কোনো বিষয় না জানো, তাহলে প্রশ্ন করো। যে প্রশ্ন করে, সে অজ্ঞ থাকে না; বরং যে জানে না অথচ জানতে চায় না, তার শেখার পথটাই বন্ধ হয়ে যায়। তোমাদের কৌতূহলী চোখ আর অনুসন্ধিৎসু মন-ই একদিন তোমাদের অনেক দূর নিয়ে যাবে। তোমরা শুধু আজকের শিক্ষার্থী নও; তোমরাই আগামী দিনের লেখক, শিক্ষক, গবেষক, শিল্পী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, উদ্যোক্তা ও সমাজের দায়িত্বশীল মানুষ। তোমাদের চিন্তা যত সুন্দর হবে, তোমাদের ভবিষ্যৎও তত সুন্দর হবে। তাই স্বপ্ন দেখো। পড়ো। জানো। ভুল থেকে শেখো। আর প্রতিদিন নিজেকে গতকালের চেয়ে একটু ভালো করার চেষ্টা করো।

ইতি
তোমাদেরই আন্দালিব ভাই

বলতো দেখি?

এ সংখ্যার প্রশ্ন

১. 'NATO' এর পূর্ণরূপ কী?
২. শাইখুল ইসলাম হাফিয ইবন হাজার আল আসকালানী (র.) কবে ইন্তিকাল করেন?
৩. তুরস্ক কত সালে ন্যাটোর সদস্য হয়?
৪. বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর পিতার নাম কী?
৫. 'হেবা' (هِبَة) শব্দের অর্থ কী?

গত সংখ্যার উত্তর

১. সাত শ্রেণির লোক।
২. মাইকেল এইচ. হার্ট (Michael H.Hart)।
৩. হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)।
৪. মেরুদণ্ডের শেষ অংশ।
৫. ইরাকের বাগদাদ শহরে।

যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে [প্রথম দুইজন পুরস্কৃত]

মোহাম্মদ রাশেদ আলম, তাফসীরুল কোরআন আলিম মাদরাসা, জালালপুর, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট # মুনতাকা জামান মাহী, হযরত শাহজালাল লতিফিয়া মাদরাসা গোলাপগঞ্জ # আবু সাঈদ মাইন, ফরিদপুর, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # নূর আহমদ রাহাত, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # মাহবুবা জান্নাত সামিয়া, ছকাপন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আব্দুল্লাহ আল মুসাদ্দিক, দারুন্নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদরাসা, ডেমরা, ঢাকা # তানজিনা রহমান ইমরা, হলিয়ারপাড়া সুন্নিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ # রাশেদ আহমদ, হাসিমপুর আহমদিয়া দাখিল মাদরাসা, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আহসানা জান্নাত, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # হাফিজুর রহমান, মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসা, মৌলভীবাজার # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট।

শব্দকল্প

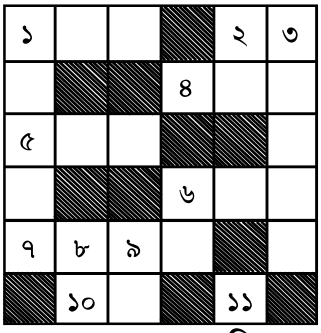

সূত্র : পাশাপাশি

১। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত ভাগীরথী তীরবর্তী ঐতিহাসিক স্থানবিশেষ ২। কানের গহনা বিশেষ, অক্ষ ৪। রব, সৃষ্টিকর্তা ৫। একটি মুসলিম রাষ্ট্র ৬। বাতায়ন, গবাক্ষ ৭। নাস্তানাবুদ, পর্যুদস্ত ১০। উপবৃত্তাকার কালচে বাদামি তন্তুময় রসালো ফলবিশেষ।।

সূত্র : উপর-নীচ

১। একটি বাংলা জাতীয় মাসিক ২। তুলাদণ্ডের পণ্য বা বাটখারা রাখার পাত্র ৩। ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত সূফী-সাধক ৬। মাছ ধরার ফাঁদ বিশেষ ৮। জয়লাভ ৯। লাঙল, দশা ১১। জননী, জন্মদাত্রী।

গত সংখ্যার শব্দকল্পের সমাধান

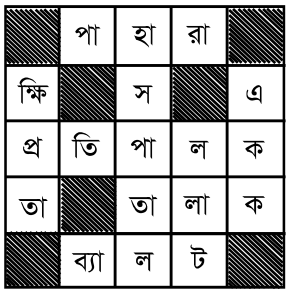

গত সংখ্যার শব্দকল্পের পরিকল্পনাকারী
তায়্যিব বিন ইয়াসিন
বুরাইয়া, ছাতক, সুনামগঞ্জ

যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে (প্রথম দুইজন পুরস্কৃত)

উদয় রহমান পাশা, লতিফিয়া কমপ্লেক্স ফুলতলী, জকিগঞ্জ, সিলেট # তাহমিদুর রহমান চৌধুরী, লতিফিয়া কমপ্লেক্স, সিলেট # মোহাম্মদ রাশেদ আলম, তাফসীরুল কোরআন আলিম মাদরাসা, জালালপুর, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট # রাশেদ আহমদ, হাসিমপুর আহমদিয়া দাখিল মাদরাসা, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আবু সাঈদ মাইন, ফরিদপুর, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মুহাইমিন চৌধুরী তালহা, ক্যাপ্টেন একাডেমি, শাহজালাল উপশহর, সিলেট # আহসানা জান্নাত, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # হাফিজুর রহমান, মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসা, মৌলভীবাজার # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # মাহবুবা জান্নাত সামিয়া, ছকাপন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।

বর্ণকল্প

এ সংখ্যার বর্ণকল্প

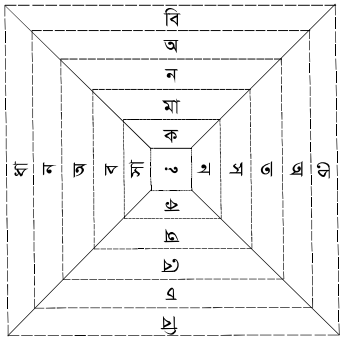

বর্ণগুলো এলোমেলো আছে। এগুলো সাজিয়ে কেন্দ্রের ফাঁকা ঘরে একটি মাত্র বর্ণ বসালে চারটি অর্থবোধক শব্দ তৈরি হবে। চেষ্টা করে দেখতো অর্থসহ শব্দ চারটি তৈরি করতে পারো কি না! সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে।

গত সংখ্যার সমাধান

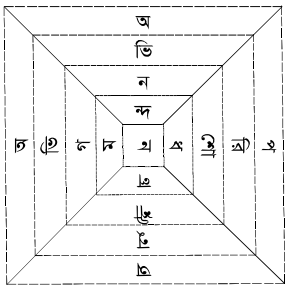

গত সংখ্যার বর্ণকল্পের পরিকল্পনাকারী
আব্দুস সাদিক
হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট

যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে

তাছনুবা তাবাসসুম নোহা, কুলাউড়া দারুসসুন্নাহ মডেল দাখিল মাদরাসা, সাদেকপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মুনতাকা জামান মাহী, হযরত শাহজালাল লতিফিয়া মাদরাসা গোলাপগঞ্জ # মোহাম্মদ রাশেদ আলম, তাফসীরুল কোরআন আলিম মাদরাসা, জালালপুর, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট # তাহমিদুর রহমান চৌধুরী, লতিফিয়া কমপ্লেক্স, সিলেট # রাশেদ আহমদ, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # আহসানা জান্নাত, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # হাফিজুর রহমান, মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসা, মৌলভীবাজার # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # আবু সাঈদ মাইন, ফরিদপুর, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মাহবুবা জান্নাত সামিয়া, ছকাপন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আব্দুল্লাহ আল মুজাদ্দিদ, ছকাপন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।

অদ্ভুত পৃথিবী



আমাজন জঙ্গল

আমাজন জঙ্গল পৃথিবীর বৃহত্তম এবং সবচেয়ে রহস্যময় ট্রপিক্যাল রেইনফরেস্ট, যা দক্ষিণ আমেরিকার ৯টি দেশ জুড়ে প্রায় ৫৫ থেকে ৭০ লাখ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে বিস্তৃত। এর সিংহভাগ অংশ ব্রাজিলে অবস্থিত, যা পেরু, কলম্বিয়া, এবং অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে আছে। জীববৈচিত্রে ভরপুর এই জঙ্গলকে ঘিরে রয়েছে নানা রহস্য। এই বিশাল বনভূমি পৃথিবীর মোট অক্সিজেনের প্রায় ২০ শতাংশ সরবরাহ করে। এজন্য এটাকে পৃথিবীর ফুসফুস বলা হয়।

আমাজনের প্রধান রহস্যসমূহ

- **অজানা প্রজাতির সমাহার:** বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই জঙ্গলে যত উদ্ভিদ ও প্রাণী রয়েছে, তার বড় একটি অংশ এখনও মানুষের অজানা। এখানে প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন প্রজাতির সন্ধান পাওয়া যায়।
- **অনাবিষ্কৃত এলাকা:** এই গভীর জঙ্গলের এমন অনেক দুর্গম জায়গা রয়েছে যেখানে আজ পর্যন্ত কোনো মানুষের পা পড়েনি।
- **ভয়ংকর প্রাণী ও নদী:** অ্যানাকোন্ডা, পিরান্ধা এবং বিষাক্ত মাছের পাশাপাশি আমাজন নদীর ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে নানা অজানা বিপদের গল্প। এর অন্ধকার ও গভীরতা নিয়ে প্রচলিত আছে আমাজন জঙ্গলের অজানা ভয়ংকর রহস্য।
- **কালো জৈব সার:** আমাজন অববাহিকায় এক ধরনের কালো জৈব সার যার মিশ্রণে মাটির উর্বরতা অবিশ্বাস্যভাবে বাড়ে। কাঠকয়লা-কালো মাটির এই স্তরটি, ৩ দশমিক ৮ মিটার (১২.৫ ফুট) পুরু। ক্ষয়প্রাপ্ত জৈব পদার্থ এবং শস্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় পুষ্টি নাইট্রোজেন, পটাসিয়াম এবং ফসফরাসে সমৃদ্ধ। রেইনফরেস্টের মাটি সাধারণ বালুকাময় মাটি থেকে পাতলা। এটি প্রাকৃতিকভাবে জমা হয়নি। এই মাটি বিভিন্ন সময়ের ধ্বংসাবশেষ। বিজ্ঞানীরা এই মাটির অবিশ্বাস্য উর্বর ক্ষমতার গোপন রহস্য উদঘাটন করার জন্য মাটির পরীক্ষা করে দেখলেন, এই মূল্যবান স্তরটিতে অজৈব উপাদানের শক্তিশালী মিশ্রণ। যার মধ্যে রয়েছে মৃৎশিল্প, বিশেষ হাড়, মুরগির ছাঁট, মানুষের মল, কাঠকয়লা, ছাই এবং মাছের হাড়। এর মধ্যে রয়েছে জৈব পদার্থ যেমন খাদ্য স্ক্র্যাপ, সার। এটি একই সাথে প্রাচীন আবর্জনার ভান্ডার যা প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই উর্বর মাটি- রেইনফরেস্টকে সমৃদ্ধ করছে। আজও আদিবাসী সম্প্রদায় এই পদ্ধতি ব্যবহার করে চাষাবাদ করে। প

আবাবিল ফৌজের সদস্য হলো যারা

৩৬৮১. আইনুল হুদা তামিম
পিতা: সুলতান আহমদ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হযরত শাহজালাল লতিফিয়া আইডিয়াল আলিম মাদ্রাসা
গ্রাম: তাজপুর
ডাক: হরিধরপুর
জেলা: নবীগঞ্জ
উপজেলা: হবিগঞ্জ

৩৬৮২. ইয়ামিন মাহমুদ নিহান
পিতা: নাজমুল হুদা নয়ন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হযরত শাহজালাল লতিফিয়া আইডিয়াল আলিম মাদ্রাসা
গ্রাম: ডুবাঐ
ডাক: ডুবাঐ বাজার
জেলা: হবিগঞ্জ
উপজেলা: বাহুবল

৩৬৮৩. সাজিবুর ইসলাম
পিতা: মাহফুজুল হাসান সোহাগ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হযরত শাহজালাল লতিফিয়া আইডিয়াল আলিম মাদ্রাসা
গ্রাম: দক্ষিণ দৌলতপুর
ডাক: একে হিরাগঞ্জ
জেলা: হবিগঞ্জ
উপজেলা: নবীগঞ্জ

৩৬৮৪. মাহবুবুর রহমান
পিতা: মহদ্দুস মিয়া
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হযরত শাহজালাল লতিফিয়া আইডিয়াল আলিম মাদ্রাসা
গ্রাম: বানিয়াচং
ডাক: হবিগঞ্জ
জেলা: হবিগঞ্জ
উপজেলা: নবীগঞ্জ

৩৬৮৫. মো. আশরাফুল ইসলাম
পিতা: এইচ.কে মাসুক মিয়া
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: দারুন নাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা
গ্রাম: খাগাউড়া
ডাক: রইছগঞ্জবাজার
থানা: বাহুবল
জেলা: হবিগঞ্জ

৩৬৮৬. আয়শা রুশদা
পিতা: রেদওয়ান আহমদ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা
ঠিকানা- শাহজালাল লতিফিয়া আবাসিক এলাকা, সোবহানীঘাট, সিলেট।

৩৬৮৭. আব্দুল মুত্তাকিন
পিতা: রেদওয়ান আহমদ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা
ঠিকানা- শাহজালাল লতিফিয়া আবাসিক এলাকা, সোবহানীঘাট, সিলেট।

৩৬৮৮. মুহাইমিন তালহা
পিতা: রেদওয়ান আহমদ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা
ঠিকানা- শাহজালাল লতিফিয়া আবাসিক এলাকা, সোবহানীঘাট, সিলেট।

৩৬৮৯. ওয়াজিহা
পিতা: বুরহান আহমদ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা
ঠিকানা- শাহজালাল লতিফিয়া আবাসিক এলাকা, সোবহানীঘাট, সিলেট।

লতিফ ট্রাভেলস

লতিফ হলিডেইজ

IATA ATAB TAAB

হজ্জ লাইসেন্স নং-২৪৯ | ওমরা লাইসেন্স নং-৩১২

প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যের ৬৪ লতিফ ট্রাভেলস

হজ্জ & ওমরা এজেন্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
হজ্জ নীতিমালা অনুযায়ী (ক্রমিক নং অনুযায়ী হজ্জ যাত্রা নিশ্চিত করা হবে) পরবর্তী হজ্জের জন্য
হজ্জ রেজিস্ট্রেশন চলছে হজ্জ যাত্রা নিশ্চিত করতে আপনার
নিকটবর্তী আমাদের যেকোন শাখায় রেজিস্ট্রেশনের আজই যোগাযোগ করুন -

এয়ার টিকেট
প্যাকেজ ট্যুর
ম্যানপাওয়ার
ভিসা প্রসেসিং

হযরত শাহজালাল রোড। দরগা গেইট
হোটেল হলি ইনের পার্শ্বে। সিলেট।
০১৯৭৩৩০৭২৯। ০১৩১৮২১০০৭৩

১১৯-১২৪ আর.বি কমপ্লেক্স
(নীচ তলা)। পূর্ব জিন্দাবাজার। সিলেট
০৮২১-৭১৪৩২২ ০১৭১১ ৩৩০ ৭২৯
latiftravels1962@gmail.com

ষ্টেশন রোড। ভার্থখলা। সিলেট
০৮২১-৭১৭৪৩৭। ৭১৪৪৭৬। ৭১৫২৪৩
০১৭১১ ০০৬ ১০৫। ০১৮৪৬ ৩৯০ ৭৮৪
latiftravels@hotmail.com

১০৪-১০৯ রোজ ভিউ কমপ্লেক্স
(নীচতলা)। শাহজালাল উপশহর। সিলেট
০৮২১ ৭২৪০০৭ ০১৭১১ ৩২২২৪৪
latiftravels@gmail.com

বিয়ানীবাজার : হাজী সিরাজ ভবন, ২য় তলা কলেজ রোড, বিয়ানীবাজার। ০১৭৭১ ১৪৪ ৬৬৬
বড়লেখা : হাবীব মার্কেট (২য় তলা), পূবালী ব্যাংক সংলগ্ন, বড়লেখা। ০১৭০০ ৭৮৮ ১৫০
মৌলভীবাজার : কুসুমবাগ শপিং সিটি (নীচতলা), কুসুমবাগ, মৌলভীবাজার। ০১৭১২ ৬৮৭ ৮৭১
শমশের নগর : এম কে রহমান ট্রেড সেন্টার, ষ্টেশন রোড, শমশের নগর। ০১৭০০ ৭৮৮ ১৫৫
ঢাকা কর্পোরেট : হক চেম্বার, (৫ম তলা), দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা। ০১৯১২ ৫৭৭ ৪২৩

বিশ্বের যেকোন প্রান্ত থেকে টিকেটের সঠিক মূল্য জানুন,
ঘরে বসে নিজের টিকেট নিজেই বুকিং করুন - লতিফ ট্রাভেলস পোর্টালের মাধ্যমে
Ticketing Portal : www.latiftravels.net

latiftravels.com.bd latiftravels.com @Latiftravelsroseview

পরওয়ানা VISION



নিয়মিত ইসলামিক আলোচনা পেতে মাসিক পরওয়ানার
অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।

আপনি কি ২০২৬, ২০২৭, ২০২৮ সালের মধ্যে

হজ্জ করতে চান?

মাত্র ৩১,০০০ টাকা জমা দিয়ে আজই প্রাক নিবন্ধন করুন

ওমরাহ স্পেশাল প্যাকেজ

"আমরা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিনা তবে আমরা ব্যতিক্রম"

স্বত্বাধিকারী

আলহাজ্জ মাওলানা খাজা মঈনউদ্দীন আহমদ জালালাবাদী

+88 01711 838 624

জালালাবাদ হজ্জ কাফেলা

Khaja Air Liner

খাজা

Khaja

air Liner

Travel & Tours

হজ্জ ওমরাহ গ্রুপ

আন্তর্জাতিক এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট এন্ড টুরস

Govt. Licn. No :253, 511, 882

IATA ACCREDITED AGENT

Biman BANGLADESH AIRLINES APPROVED

TURKISH AIRLINES

BRITISH AIRWAYS

Emirates

QATAR AIRWAYS

SINGAPORE AIRLINES

US-BANGLA AIRLINES

REGENT

NOVOAIR

আমাদের নিজস্ব স্টক হতে সর্বনিম্ন মূল্যে বিশ্বের যে কোন গন্তব্যের বিমান টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা

সিলেট অফিস

সবুজ বিপনী (৩য় তলা) জিন্দাবাজার

01724 926 329, 01714 486796

www.khajaairliner.com

ঢাকা অফিস

হোটেল বকসি (২য় তলা). ফকিরাপুল

01724 691 177, 0248 313524

khajaairliner@yahoo.com

লতিফিয়া হিফযুল কুরআন একাডেমি ওসমানীনগর

LATIFIA HIFZUL QURAN ACADEMY OSMANINAGAR

জেনারেল শিক্ষা সমন্বিত একটি অত্যাধুনিক মানসম্পন্ন আবাসিক হাফিজিয়া মাদরাসা

- দাওরা বিভাগ
- হিফজ বিভাগ
- নাজারা বিভাগ

ভর্তি চলছে

বিগত বোর্ড পরীক্ষায় বৃত্তি সহ শতভাগ সফলতা

আমাদের বৈশিষ্ট্য

- অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলীর তত্ত্বাবধান।
- সুন্নাতে নববীর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ।
- সম্পূর্ণ আবাসিক ব্যবস্থাপনা।
- সর্বোচ্চ তিন বছরে হিফজ সম্পন্ন। (ইনশা আল্লাহ)
- ইয়াকুবিয়া হিফযুল কুরআন বোর্ডের সিলেবাস অনুসরণ।
- ৫ বছরে নাওয়াহ সহ ইবি: ৫ম, দাখিল ৮ম ও ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান।
- কুরআন হিফজের পাশাপাশি সম্পূরক সিলেবাস তথা বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও জাতীয় পাঠক্রমের অনুসরণ।
- বোর্ড পরীক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জনে বিশেষ তত্ত্বাবধান।
- বেসিক কম্পিউটার শিক্ষা।
- একাধিক ক্লাস টেষ্ট এবং বিষয় ভিত্তিক মডেল টেষ্ট গ্রহণ।
- প্রবাসী ছাত্রদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ।
- ছাত্রদের খেলাধুলা ও শরীরচর্চার সুযোগ সুবিধা।
- সেমিষ্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ।
- প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে সাপ্তাহিক সভা, শবিনা, বিতর্ক অনুষ্ঠান ও দেয়ালিকা প্রকাশ।

১লা ডিসেম্বর থেকে ভর্তি কার্যক্রম শুরু।
১লা জানুয়ারি মেধা যাচাই পরিক্ষা ও শ্রেণী কার্যক্রম শুরু।
৫ই জানুয়ারী নতুন ছাত্রদের হোস্টেলে আগমন।

যোগাযোগ

মাওলানা এম এ রব, প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক/প্রিন্সিপাল

01716-939918, 01612-062235, (অফিস) 01786-128128

দক্ষিণ তাজপুর বাজার, ওসমানীনগর, সিলেট।

দাউদিয়া গৌছ উদ্দিন সিনিয়র মাদরাসা

রেঙ্গা দাউদপুর, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট

"২২৫ বছরপূর্তিতে এসো মিলি একসাথে,
স্মৃতির আঙিনায় এসো মিলনের উৎসবে।"

প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষার্থী পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান

২২৫ বছর পূর্তি

১৮০০-২০২৫

৩১ অক্টোবর ২০২৬ শনিবার

স্থান
মাদরাসা ময়দান

বরেণ্য উলামা-মাশায়েখ, শিক্ষাবিদ ও
রাজনৈতিক-সামাজিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন

এতে আপনারা আমন্ত্রিত

২২৫ বছর পূর্তি ও প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষার্থী পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন কমিটি

01712-051453, 01716-942317 dgusm225year@gmail.com

সিলেটে খুব শিগগিরই

উদ্বোধন

হতে যাচ্ছে দীর্ঘদিনের স্বপ্নের বাস্তবায়ন

আন্তর্জাতিক মানের
একটি ইংলিশ ভার্সন মাদরাসা

আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নির্মাণে
আমাদের সাথেই থাকুন



লতিফ ট্রাভেলস

লতিফ হলিডেইজ

IATA ATAB TOAB TDAB

প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যের ৬৪ লতিফ ট্রাভেলস

হজ্জ লাইসেন্স নং-২৪৯ | ওমরা লাইসেন্স নং-৩১২

হজ্জ ও ওমরা এজেন্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
হজ্জ নীতিমালা অনুযায়ী (ক্রমিক নং অনুযায়ী হজ্জ যাত্রা নিশ্চিত করা হবে) পরবর্তী হজ্জের জন্য
হজ্জ রেজিস্ট্রেশন চলছে হজ্জ যাত্রা নিশ্চিত করতে আপনার
নিকটবর্তী আমাদের যেকোন শাখায় রেজিস্ট্রেশনের আজই যোগাযোগ করুন -

এয়ার টিকেট
প্যাকেজ ট্যুর
ম্যানপাওয়ার
ভিসা প্রসেসিং

হযরত শাহজালাল রোড। দরগা গেইট
হোটেল হলি ইনের পার্শ্বে। সিলেট।
০১৯৭৩৩৩০৭২৯। ০১৩১৮২১০০৭৩

১১৯-১২৪ আর.বি কমপ্লেক্স
(নীচ তলা) । পূর্ব জিন্দাবাজার । সিলেট
০৮২১-৭১৪৩২২ ০১৭১১ ৩৩০ ৭২৯
latiftravels1962@gmail.com

ষ্টেশন রোড। ভার্থখলা । সিলেট
০৮২১-৭১৭৪৩৭। ৭১৪৪৭৬। ৭১৫২৪৩
০১৭১১ ০০৬ ১০৫। ০১৮৪৬ ৩৯০ ৭৮৪
latiftravels@hotmail.com

১০৪-১০৯ রোজ ভিউ কমপ্লেক্স
(নীচতলা)। শাহজালাল উপশহর। সিলেট
০৮২১ ৭২৪০০৭ ০১৭১১ ৩২২৪৪
latiftravels@gmail.com

বিয়ানীবাজার : হাজী সিরাজ ভবন, ২য় তলা কলেজ রোড, বিয়ানীবাজার। ০১৭৭১ ১৪৪ ৬৬৬
বড়লেখা : হাবীব মার্কেট (২য় তলা), পূবালী ব্যাংক সংলগ্ন, বড়লেখা। ০১৭০০ ৭৮৮ ১৫০
মৌলভীবাজার : কুসুমবাগ শপিং সিটি (নীচতলা), কুসুমবাগ, মৌলভীবাজার। ০১৭১২ ৬৮৭ ৮৭১
শমশের নগর : এম কে রহমান ট্রেড সেন্টার, ষ্টেশন রোড, শমশের নগর। ০১৭০০ ৭৮৮ ১৫৫
ঢাকা কর্পোরেট : হক চেম্বার, (৫ম তলা), দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা। ০১৯১২ ৫৭৭ ৪২৩

বিশ্বের যেকোন প্রান্ত থেকে টিকেটের সঠিক মূল্য জানুন,
ঘরে বসে নিজের টিকেট নিজেই বুকিং করুন - লতিফ ট্রাভেলস পোর্টালের মাধ্যমে
Ticketing Portal : www.latiftravels.net

latiftravels.com.bd latiftravels.com @Latiftravelsroseview

দারুল হিকমাহ একাডেমি কমলগঞ্জ

- মেধা যাচাইয়ের মাধ্যমে ভর্তি
- ইসলামি ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয়ে প্রণীত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিক্ষাদান
- সেমিস্টার পদ্ধতিতে শিক্ষাদান, নিয়মিত মডেল টেস্ট
- কম্পিউটার শিক্ষার সুযোগ
- নিরিবিলি পরিবেশে শিক্ষাদান
- দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী দ্বারা শিক্ষাদান
- গৃহ শিক্ষকের প্রয়োজন মুক্ত ক্লাসের পড়া ক্লাসেই হাতে কলমে শেখানো ব্যবস্থা
- ইংরেজি ও আরবি স্পোকেন এর ব্যবস্থা
- নিয়মিত আখলাকী তা'লীম প্রদান
- সনদপ্রাপ্ত ক্বারীগণের মাধ্যমে বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতের বিশেষ প্রশিক্ষণ
- শিক্ষার মানোন্নয়নে ত্রি-পক্ষীয় (শিক্ষক-অভিভাবক- পরিচালনা পরিষদ) বৈঠক
- রুটিনভিত্তিক সু-শৃংখল পাঠদান ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা
- ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা, বিভিন্ন ধরণের প্রতিযোগিতা, বিতর্ক, শিক্ষা সফর ইত্যাদির মাধ্যমে সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের সুযোগ
- সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার
- গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সুযোগ

নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা

প্লে শ্রেণি থেকে স্ট্যান্ডার্ড ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক : মো. আতিকুর রহমান সাকের

সীমিত আসন

স্বল্প বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ

ক্যাম্পাস | আলেপুর (আদমপুর রোড, চেকপোস্ট-এর দক্ষিণ পার্শ্বে) কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

যোগাযোগ: ০১৭১২-৬৮৬২৮২, ০১৭১২-৭৬৭২৮৪

Al ISLAH
CASH & CARRY



CASH & CARRY AND WHOLESALE
OPEN TO THE PUBLIC
CATERERS ONESTOP SHOP
LARGE PARKING

WE SPECIALIZE IN FULL CATERING SUPPLIES
WE SPECIALIZE FOR YOUR FULL PACKAGING SUPPLIES
RICE, FLOUR, SPICES, TIN PRODUCT, PAULTRY, LAMB, MUTTON

290-294, BISCOT ROAD
LUTON, LU3 1AZ

01582 414154
07769 778127



প্রস্তাবিত ভবন

- মসজিদ
- হিফযুল কুরআন
- প্রকাশনা
- অফিস
- ভাষা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
- মাদরাসা
- ইয়াতীমখানা
- খানকাহ
- দাওয়াহ সেন্টার
- মেহমানখানা
- দারুল কিরাত
- গ্রন্থাগার
- স্টাডি সার্কেল
- মিলনায়তন
- তাখাস্সুস (হাদীস ও ফিক্হ)

مركز الفولتالي داكا

FULTOLI COMPLEX DHAKA

Khilgaon, Dhaka, Bangladesh